অলিভার টুইস্ট

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

অনুবাদ সিরিজ

অলিভার টুইষ্ট

চার্লস ডিকেন্স

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
অনূদিত
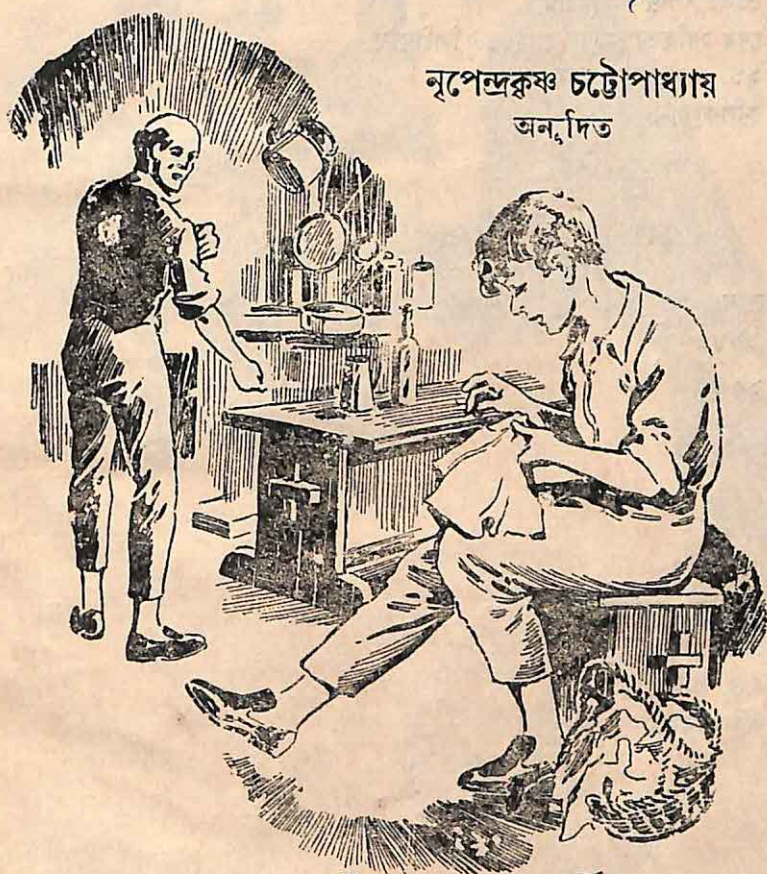
দেব সাহিত্য কুটীর
• কলিকাতা •

ALIVER TWIST
CODE NO. 4-29-194

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯

জুন
১৯৮৬
১৫

ছেপেছেন—
বি· সি· মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

দাম—
টা. ৮·০০

উপহার

এই বইখানি সম্বন্ধে

জগতের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ কিশোর-কাহিনী 'অলিভার টুইষ্ট'-এর লেখক হলেন— চার্লস ডিকেন্স। ডিকেন্স অনেক উপন্যাস লিখেছেন এবং তার প্রায় সবগুলোই জগতের উপন্যাস-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে চিরদুঃখী বালক অলিভার টুইষ্টের কাহিনী আজ সভ্য-জগতের প্রত্যেক জাতির ছেলেমেয়েদের কাছে পরিচিত। এই বইখানি পড়তে-পড়তে প্রত্যেক দেশের ছেলেমেয়েরা চোখের জল ফেলেছে। শিশুদের সেই চোখের জলে স্নান ক'রে অলিভার টুইষ্ট আজ মানুষের বুকে অমর সুন্দর মূর্তিতে বিরাজ করছে।

এই বইটা শুধু একটা গল্পের বই নয়, এই বইটা হলো—বাস্তব জীবনের একটা অংশ। অলিভার টুইষ্টের ওপর ডিকেন্সের নিজের বাল্যজীবনের কিছু ছাপ আছে। তাঁর নিজের বাল্যকালে তিনি যে দুঃখময় জীবন ভোগ করেছিলেন, তাঁর চারদিকে ইংলণ্ডের সমাজে, পথে-ঘাটে অনাথ-আশ্রমে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের যে মর্মান্তিক দুর্গতি আর দুঃখ দেখেছিলেন, তাই তিনি সভ্য মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। সমাজের উদাসীনতা আর নির্মমতার দরুণ ফুলের মতো নিষ্পাপ ছেলেমেয়েরা যে কি ভাবে দুঃখ পায়, তার করুণ কাহিনী এই বইতে এমনভাবে ফুটে উঠেছে যে, এই বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর, ইংলণ্ডের লোকের নজর সেদিকে পড়লো এবং চারদিক থেকে সদাশয় লোকেরা এগিয়ে এসে গরীব-দুঃখী অনাথ বালকদের জীবনকে সার্থক ক'রে তোলার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন এবং গভর্নমেণ্টও আইন ক'রে শিশুদের ওপর নির্যাতন বন্ধ করলেন।

আজ আমাদের দেশে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে অনেক 'অলিভার টুইষ্ট' খালি-পেটে খালি-গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমরা যারা এই কাহিনী পড়বে, তাদের কাছে আমার মিনতি, তোমরা যেন সেই অনাথ অলিভার টুইষ্টদের ভুলো না। যখন খেয়ে দেয়ে নরম লেপের তলায় গরম বিছানায় শোবে, তখন একবার মনে ক'রো তোমারই মতো আরো অনেক ছেলে বাইরে শীতে খালি-গায়ে খালি-পেটে রাস্তায় ধুলোয় শুয়ে আছে। যতদিন সেরকম একটিও ছেলে অনাথ-ভাবে রাস্তায় উপোস দিয়ে থাকবে, ততদিন জানবে তোমার জাতি, তোমার দেশ, তোমার রাষ্ট্র সত্যিকারের সভ্য হয়নি।—

একথাই ডিকেন্স ব'লে গেছেন 'অলিভার টুইষ্ট' বইতে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

এই বইয়ের লেখক

চার্লস্ ডিকেন্স

আজ থেকে প্রায় একশো বছরের কিছু আগে এক ক্রিস্‌মাস্ দিনে লণ্ডন শহরে, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে একখানি ছোট বই প্রকাশিত হলো। বইটির নাম—"ক্রিস্‌মাস্ ক্যারল্", লেখক—চার্লস্ ডিকেন্স।

সেই ছোট্ট বইখানি প'ড়ে লণ্ডন শহর পাগল হয়ে গেল। রাস্তায় দেখাশোনা হলেই লোকে আগে জিজ্ঞেস করতো, বইটা পড়েছো? যারাই পড়েছে, তারাই বলতো, ভগবান ডিকেন্সকে চিরজীবী করুন।

কিছুদিন আগে জে. পি. মর্গ্যান নামে আমেরিকার একজন ধনী লোক ইংলণ্ডে এলেন সেই ছোট্ট বইটির পাণ্ডুলিপি খোঁজ করার জন্যে। বহু খোঁজাখুঁজির পর সেই পুরোনো ময়লা পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেল। মর্গ্যান প্রায় দু'লক্ষ টাকারও বেশী দাম দিয়ে সেই পাণ্ডুলিপিটি কিনে নিয়ে গেলেন।

অথচ ডিকেন্স যখন দশ বছরের ছেলে, তখন তাঁকে উপোস দিয়ে দিন কাটাতে হতো; ঘটি বাটি বাঁধা দিয়ে কোনোরকমে দিন চলতো তাঁর। সেই নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে স্বভাবতঃই তাঁর স্কুলের লেখাপড়া শেখা হয়নি। কিন্তু নিজের চেষ্টায় তিনি অন্ততঃ সতেরোখানি এমন বই লিখে রেখে গেছেন, যা যতদিন ইংরেজী ভাষা থাকবে, ততদিন বেঁচে থাকবে।

ডিকেন্সের বয়স যখন বাইশ বছর, চারদিকে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কোথাও কোনো কাজ পাচ্ছেন না, সেসময় লুকিয়ে-লুকিয়ে তিনি গল্প লিখতে শুরু করলেন। প্রথম যে গল্পটা তিনি ছাপাবার জন্যে কাগজে পাঠান, তার সম্বন্ধে তাঁর মনে এত ভয় আর লজ্জা ছিল যে, পাছে কেউ দেখে ফেলে, সেজন্যে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে-লুকিয়ে ডাক্-বাক্সে দিয়ে আসেন। সেই গল্প যখন ছাপা হয়ে বেরুলো, তিনি আনন্দে দিশেহারা হয়ে সারাদিন লণ্ডনের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু সেই গল্প কিংবা তার পরের আট-টা গল্পের জন্যে তিনি একটি পয়সাও পাননি। অথচ পরে তাঁকে তাঁর শেষ গল্পের জন্যে মাসিক-পত্রের মালিকেরা কথা-পিছু প্রায় পঞ্চাশ টাকা ক'রে দাম দিয়েছেন, অর্থাৎ গল্পের মধ্যে যদি তিন হাজার কথা থাকে, তাহলে তিনি পেয়েছেন দেড় লক্ষ টাকা।

তিনি চোখের সামনে সমাজের যে রূপ দেখেছিলেন, প্রতিদিনের জীবনে যে-সব মানুষকে ঘুরতে-ফিরতে দেখেছিলেন, তাদের চরিত্র তিনি নিখুঁতভাবে এঁকে গেছেন!

তাই তাঁর আঁকা বেশির ভাগ চরিত্রই বাস্তব ও জীবন্ত। সেজন্যেই তাঁকে রিয়ালিষ্টিক লেখক বলা হয়।

ডিকেন্সের পরবর্তী জীবন সুখ, সৌভাগ্য ও যশে অতিবাহিত হয়। আমেরিকা তাঁকে আদর ক'রে ডেকে নিয়ে যায়। তাঁর বই আজ জগতের সব সভ্য দেশের ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তিনি শুধু ইংলণ্ডের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক নন্; তিনি জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক।

সম্পাদক

অলিভার টুইস্ট

প্রথম পরিচ্ছেদ

একশো বছর আগের ইংলণ্ড। এক নিশুতি রাতে লণ্ডন শহরের প্রায় সত্তর মাইল দূরে জনমানবহীন সড়কের ওপর দিয়ে চলেছে এক তরুণী। সঙ্গীসাথী তার কেউ নেই। যাবে সে কাছাকাছি কোনো একটা বড়ো শহরে। অনেক দূর থেকে আসছে সে শরীরে একটা ভারী বোঝা নিয়ে।

ঘন কুয়াশায় ঢাকা চারদিক। তাই পথের নিশানা মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলছে সে। তবুও তার পথ চলার বিরাম নেই। দেহ তার ক্রমেই অবশ হয়ে পড়ছে। জুতো কেটে পা দিয়ে রক্ত ঝরছে। ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে হাঁটতে আর পারে না সে, কিন্তু তবু তাকে এগিয়ে যেতেই হবে—বেহুঁশ হয়ে পড়ার আগে তাকে শহরে পেঁ ছোতেই হবে। তাই কোনোরকমে সে দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে এগিয়ে নিয়ে যায় শহরের দিকে বাঁচার তাগিদে।

কুয়াশার আবরণ ভেদ করে একটা চলমান লণ্ঠনের ফিকে আলো নজরে পড়ে তরুণীর। এবার সে পা চালায় তাড়াতাড়ি। মনে তার আশার আলো জেগে উঠেছে। নিজের কথা সে আর ভাবে না। এখন সে বাঁচাতে চায় তার ভাবী সন্তানকে মানুষের সাহায্য নিয়ে।

কিন্তু আর সে হাঁটতে পারে না। 'উঃ মাগো' বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। দেহের অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙাতে থাকে সে। মাটি হাতড়ে হাতড়ে কিছুটা পথ এগোবার সে চেষ্টা করে। কিন্তু শেষে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে পথের মাঝে। ধুলো আর রক্তে মাখামাখি হয় তার সারা দেহ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই লণ্ঠনের আলো এগিয়ে এসে তরুণীর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়লো। চকিতে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে লণ্ঠনের মালিক তখনি তরুণীকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে পাড়ি দিলো শহরের দিকে।

শহরের এক ধারে অন্ধকার এক গলির ভেতর একটা ভাঙা পোড়ো বাড়ি। দরজায় কাঠের ওপর লেখা 'অনাথ-আশ্রম'। মৃতপ্রায় তরুণীকে নিয়ে আসা হলো সেখানে। আশ্রমের বারান্দায় তাকে ফেলে রেখে লোকটি ছুটে গেলো আশ্রমের ডাক্তারকে ডাকতে। তার হাঁকডাকে আশ্রমের বাসিন্দা

অনাথা স্যালী বুড়ী ছুটে এলো। প্রয়োজনের তাগিদে স্যালী বুড়ী কখনো কখনো ধাইয়ের কাজও করে থাকে।

স্যালী বুড়ীর ছোট্ট ঘরেই মূর্ছিতা তরুণীটি শেষে আশ্রয় পেলো। হাতে পায়ে গরম সেঁক দেবার পরে ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এলো তার। স্যালী বুড়ীর হেফাজতে তাকে রেখে ডাক্তার চলে গেলেন অন্য ঘরে।

কিছুক্ষণ বাদেই জন্ম হলো একটি শিশুর। তার মা সেই তরুণীর রক্ত-হীন পাণ্ডুর ঠোঁট দুখানি নড়ে উঠলো। অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে সে : "আমার কাছে ওকে নিয়ে এসো। মরার আগে আমার সন্তানকে দেখতে দাও একবার।" এই বলে সে অতিকষ্টে বালিশ থেকে ঘাড় তুলে পাশেই তার নবজাত শিশুর কপালের ওপর নিজের মুখটা চেপে ধরেই এলিয়ে পড়লো। ডাক্তার এসে নাড়ী টিপে বললেন : "সব শেষ !"

মৃতার জন্যে শোক করার কেউ নেই। তাই অবহেলাভরে লাশ ঢেকে দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন। যাবার আগে ডাক্তার একবার জিজ্ঞাসা করলেন স্যালী বুড়ীকে : "বেশ দেখতে ছিলো মেয়েটি—কোথা থেকে এসে-ছিলো ?"

বুড়ী উত্তর দিলো : "রাতেই কুড়িয়ে আনা হয়েছে ওকে। পথে পড়ে ছিলো। জুতোর হাল দেখে মনে হয়, অনেকখানি পথ সে হেঁটে এসেছে, কিন্তু কোথা থেকে সে এসেছিলো, আর যাচ্ছিলোই বা কোথায়, তা জানে না কেউ।"

ডাক্তার বললেন : "ওঃ! সেই একই পুরোনো জবাব !"

ডাক্তার চলে যেতেই স্যালী বুড়ী এবার শিশুকে বাঁচাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো। অনেকক্ষণ ধরে জীবন-মরণের টানা-পোড়েনের মধ্যে পড়ে হাঁপাতে লাগলো শিশুটি। তার খোঁজ-খবর নেবার জন্যে কোনো মাসী-পিসী বা খুড়ী-জেঠী সেখানে ছিলো না। এমনকি তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে কোনো ভালো ডাক্তারও মাথা ঘামালো না। তবুও এতো অনাদরে অযত্নে শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলো সে। তাকে দেখাশুনো করার জন্যে ছিলো কেবল অনাথ-আশ্রমের সেই অনাথা স্যালী বুড়ী আর দায়ে-ঠেকা সেই হাতুড়ে ডাক্তার।

শত অবহেলাতেও শিশুটি যখন দুনিয়ার আলো বাতাসকে আঁকড়ে রইলো, মরণের নামটিও করলো না, তখন আশ্রমের কর্মকর্তারা তার একটা নাম রাখতে বাধ্য হলেন। আশ্রমের রেকর্ডে শিশুটির নাম লেখা হলো অলিভার টুইষ্ট। বাপ-মায়ের পরিচয় নেই বলেই শিশু

অলিভারকে রেখে দেওয়া হলো অনাথ-আশ্রমের একটা অবাঞ্ছিত বোঝা হিসেবে।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশু অলিভারের গায়ে উঠলো অনাথ-আশ্রমের মোটা আঙ্‌রাখা। সে হয়ে গেলো তাদেরই একজন—আধ-পেটা খাওয়া হীন কেনা গোলাম যারা, কিলচড় আর গালমন্দ সয়ে যারা বেঁচে থাকে দুনিয়ায়, যাদের ঘেন্না করে সবাই, কিন্তু দয়া করে না কেউ, অনাথ-আশ্রমের সেই অসহায় শিশুদের একজন।

দশ মাস পরে শিশু অলিভারকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো তিন মাইল দূরে অনাথ-আশ্রমের জন্য এক কর্মকেন্দ্রে। যেসব ছোটো-ছোটো ছেলে আইন ভেঙে পুলিসের হাতে ধরা পড়তো, তাদের ওই কর্মকেন্দ্রে আটকে রাখা হতো। সেখানে থাকতো ওইরকম বিশ-তিরিশ জন কিশোর অপরাধী। নিষ্পাপ শিশু অলিভারের সঙ্গী হতো তারা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অনাথ-আশ্রমের যে কর্মকেন্দ্রে শিশু অলিভারকে পাঠানো হলো দশ মাস বয়সে, মিসেস্ ম্যান্ ছিলেন তার পরিচালিকা। ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়েদের দেহ ও মন কতো সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে নাকি মিসেস্ ম্যান্ বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাই অনাথ-আশ্রমের প্রধান কর্মকর্তারা তাঁকে কিশোর অপরাধীদের অভিভাবক হিসেবে নিযুক্ত করে নিশ্চিন্ত ছিলেন। মিসেস্ ম্যান্ ওইসব কিশোরদের নিয়ে নানা-ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন, বিশেষ করে সবচেয়ে কম খাবার আর সবচেয়ে কম পোশাক দিয়ে কি ক'রে ছেলেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারা যায়, সেদিকে তাঁর নজর ছিলো প্রখর। ছেলেদের কোনো অনিয়মই তিনি সইতে পারতেন না। তাঁর আশ্রমের কোনো ছেলে হলফ করে বলতে পারবে না যে, বে-নিয়ম ক'রে সে বরাদ্দ খাবারের একটা কণাও কোনো দিন বেশী খেতে পেয়েছে। প্রত্যেক ছেলে-পিছু খরচ করার জন্যে তিনি প্রতি সপ্তাহে সরকার থেকে পেতেন সাড়ে সাত পেনী। পাছে বেশী খেয়েপরে ছেলেদের মেজাজ বিগড়ে যায়, সেজন্যে তিনি সরকারের দেওয়া ওই সামান্য অর্থের বেশ মোটা একটা অংশ নিজের তহবিলে জমাতেন। অবশ্য ছেলেগুলো ছিলো বড্ড পাজী, তাই মিসেস্ ম্যান্‌কে সকলের চোখে হেয় করার জন্যে তারা বেশীর ভাগ বড় হবার আগেই মারা যেতো অসুখে ও অনাহারে।

যদি কোনোরকমে তাদের কেউ বেঁচে থাকতো, তাহলে কতো কম খাবারে মানুষ জান বাঁচিয়ে থাকতে পারে তার একটা নমুনা হিসেবে দুনিয়ার সামনে তাকে তুলে ধরা যেতে পারতো।

মিসেস্ ম্যানের দেওয়া আদর্শ খাবার নিয়মিত খেয়ে অলিভারের বয়স যখন ন'বছর হলো, তখন তার রোগা লিকলিকে ছোটোখাটো চেহারা ও তার সাদা চামড়ার দিকে চেয়ে কেউ অনুমানই করতে পারতো না যে, তার দেহে কোথাও একফোঁটা রক্ত আছে। কিন্তু বাপ-মায়ের কাছ থেকে পাওয়া বা প্রকৃতির দেওয়া এমন একটা জিনিস সে পেয়েছিলো তার দেহে ও মনে, যা মিসেস্ ম্যানের শত চেষ্টাতেও খোয়া গেলো না। তার সরল, সুন্দর, নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে সকলেরই তাকে ভালবাসতে ইচ্ছা করতো।

সেদিনটা ছিলো অলিভারের নবম জন্মতিথি। অলিভার সারাটা দিন দুজন কিশোর ছেলের সাথে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করা কয়লা মজুত রাখার ছোটো কুঠরীতে আটকে রইলো মিসেস্ ম্যানের হুকুমে। ওদের অপরাধ, ওরা নাকি বড্ড বেশী খাই খাই করেছে সেদিন। এহেন দিনে হঠাৎ সেখানে হাজির হলেন অনাথ-আশ্রমের প্রধান পরিচালক মিস্টার বাম্ব্‌ল। ঘরের জানালা দিয়ে কুটীরের দরজার সামনে তাঁকে দেখেই মিসেস্ ম্যান্ বেশ ঘাবড়ে গেলেন। তিনি তখনি অলিভার ও তার সঙ্গী দুজনকে অবিলম্বে কয়লা-কুঠরী থেকে বের করে দোতালায় নিয়ে গিয়ে ভালো করে গা রগড়ে ধুয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন পরিচারিকাকে। তাঁর ভয় হলো, মিস্টার বাম্ব্‌ল যদি ওদের কয়লা-মাখা অবস্থায় দেখতে পান, তবে তার বদনাম দিতে কসুর করবেন না তিনি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মিসেস্ ম্যান্ খাতির যত্ন করলেন মিঃ বাম্ব্‌লকে। ভালো ভালো পানীয় খেতে দিলেন তাঁকে। খেতে খেতে মিঃ বাম্ব্‌ল জানালেন যে, কুড়ি পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা ক'রেও অলিভারের বাপ-মায়ের কোনো পরিচয় বা খোঁজ পাওয়া যায়নি, আর ওর এখন বয়স বেড়েছে বলে ওকে এবার অনাথ-আশ্রমের কর্মকর্তারা তাঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে কাজের লায়েক করে তুলতে চান। তাই অলিভারকে সেখানে নিয়ে যেতে এসেছেন তিনি।

একথা শুনে মিসেস্ ম্যান্ অলিভারকে নিয়ে এসে হাজির করলেন মিঃ বাম্ব্‌লের সামনে। মিসেস্ ম্যানের কথামতো অলিভার মিঃ বাম্ব্‌লকে নমস্কার জানালো।

মিঃ বাম্ব্‌ল জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কি হে অলিভার, তুমি কি আমার সাথে যাবে ?"

মিসেস্ ম্যানের খপ্পর থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পেতে চায় অলিভার, তাই সে জবাব দিতে যাচ্ছিলো যে সে মিঃ বাম্ব্‌লের সাথে যেতে খুবই আগ্রহী, কিন্তু জবাবটা তার মুখে আট্‌কে গেলো মিসেস্ ম্যানের দিকে তাকিয়ে। অলিভার দেখলো,—মিসেস্ ম্যান্ মিঃ বাম্ব্‌লের চেয়ারের পেছনে সরে গিয়ে চোখ রাঙিয়ে হাতের ঘুষি দেখাচ্ছেন তাকে লক্ষ্য করে। ভয় পেলো বেচারা অলিভার। আমতা আমতা করে সে মিঃ বাম্ব্‌লকে জিজ্ঞাসা করলো মিসেস্ ম্যানের দিকে আঙুল দেখিয়েঃ "উনিও কি আমার সাথে যাবেন ?"

মিঃ বাম্ব্‌ল বললেনঃ "আরে না-না। উনি কেন যাবেন তোমার সাথে ? তোমাকে একলাই যেতে হবে আমার সাথে।"

পরিস্থিতি বোঝার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি ছিলো অলিভারের, তাই সে কেঁদে ভাসিয়ে দিলো মিসেস্ ম্যান্‌কে ছেড়ে যেতে হবে বলে। মিসেস্ ম্যান্‌ও কিছুমাত্র দেরি না করে অলিভারকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, আর সাথে সাথে বিদায় সম্ভাষণও জানালেন। এভাবে দুজনের মধ্যে নিষ্প্রাণ ভালো-বাসার অভিনয় হবার পর অলিভার তার বিগত ন বছরের আশ্রয় ছেড়ে রওনা হলো মিঃ বাম্ব্‌লের সাথে অনাথ-আশ্রমের প্রধান কর্মকেন্দ্রে যাবার জন্যে। তার ডান হাতে মিসেস্ ম্যানের দেওয়া একটুকরো পাঁউরুটি, আর মাথায় অনাথ-আশ্রমের মার্কামারা ছোট্ট বাদামী টুপি।

মিসেস্ ম্যানের কুটীরের দরজা পেরিয়ে অলিভার রাস্তায় নামার সাথে সাথে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো। পেছন ফিরে তাকিয়ে তা দেখতে পেয়েই অলিভারের চোখে জল এলো। যে কুটীরের ভেতরে অলিভার কোনোদিন একটা দরদভরা কথা কারও মুখ থেকে শোনেনি, যেখানে সে কেবল পেয়েছে লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা, যেখানে খিদের সময় খাবারের বদলে সে পেয়েছে তাড়না, সেই মিসেস্ ম্যানের কুটীর ছেড়ে চলে আসার সময় তার মুখে নেমে এলো শোকের ছায়া। যেসব বন্ধুদের সে রেখে এলো ওই কুটীরে, তাদের দুঃখময় জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে সে পথ চলতে লাগলো। এই বিশাল দুনিয়ার অচেনা পথে এবার থেকে তাকে একা চলতে হবে, তাই তার মন অজানা আশঙ্কায় বিচলিত হয়ে উঠলো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বালক অলিভারকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন মিঃ বাম্ব্‌ল। এর আগে অলিভার একনাগাড়ে এতটা পথ হাঁটার সুযোগ পায়নি কখনো। তাই একদিকে যেমন পথ চলতে অসুবিধে হওয়ায় সে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছিলো, তেমনি আশেপাশে নানা অপরিচিত দৃশ্য দেখে কখনো কখনো হতবাক্ হচ্ছিলো। পথ চলায় অলিভারের এই ধরনের গাফিলতি মিঃ বাম্ব্‌ল সইতে পারলেন না। তিনি ধমক দিলেন কয়েকবার তাকে, শেষে কানমলা ও কোঁৎকা দিয়ে তার পথ চলার গতি বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই বালক অলিভার তাঁর মতো একটা ধুম্‌সো লোকের সাথে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে পারলো না। একে তার খিদেয় পেট জ্বলছে, তার ওপর পথ চলার অভ্যাস নেই তার। তাই মিঃ বাম্ব্‌লের হুমকি কোনো কাজেই লাগলো না। অবশ্য মিঃ বাম্ব্‌লকে খুশী করার জন্যে অলিভারের চেষ্টার কসুর ছিলো না একটুও। সত্যি কথা বলতে কি, রোগা লিক্‌লিকে ফ্যাকাসে ছোটোখাটো চেহারা নিয়ে অলিভারকে দৌড়োতে হয়েছিলো মিঃ বাম্ব্‌লের পেছনে পেছনে।

এভাবে অলিভারকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে মিঃ বাম্ব্‌ল যখন অনাথ-আশ্রমের প্রধান কর্মকেন্দ্রে হাজির হলেন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এসেই শুনলেন যে আশ্রমের কর্মকর্তাদের সভা শুরু হয়ে গেছে, আর অলিভারকে নিয়ে সভায় হাজির হবার জন্যে তাঁর ঘন ঘন ডাক এসেছে সভাপতি মিঃ লিম্ব্‌কিনের কাছ থেকে। একথা শোনামাত্র মিঃ বাম্ব্‌ল অলিভারকে দুচার মিনিট বিশ্রাম করার সুযোগ না দিয়েই তাকে বগলদাবা করে টানতে টানতে হন্তদন্ত হয়ে সভায় হাজির হলেন।

কর্মকর্তাদের সভায় হাজির হয়ে অলিভার দেখলো, আট দশজন ভদ্রলোক একটা মস্ত বড়ো টেবিলকে ঘিরে চেয়ারে বসে কথাবার্তা কইছেন আর মাঝে মাঝে কতকগুলো লেখা কাগজ পড়ছেন। তাঁদের মধ্যে একজন একটু উঁচু চেয়ারে বসে আছেন।

অলিভারকে টেবিলের দিকে এগিয়ে দিয়ে মিঃ বাম্ব্‌ল বললেনঃ "অলিভার, ওঁদের নমস্কার জানাও—ওঁরাই তোমাকে এতদিন খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছেন।"

খিদের জ্বালায় আর পথশ্রমে অলিভারের চোখে বিন্দু বিন্দু জল জমেছিল। চোখের জল মুছে সে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালো কর্মকর্তাদের।

যিনি উঁচু চেয়ারে বসে ছিলেন, তিনি হলেন সভাপতি মিঃ লিম্ব্‌কিন্‌। একটিপ্‌ নস্যি নিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন : "খোকা, তোমার নাম কি ?"

প্রশ্নের সাথে সাথে এতোগুলো লোককে তার মুখের দিকে এক নজরে তাকাতে দেখেই অলিভার ঘাবড়ে গেলো। ভয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে তার পা কাঁপছিলো, গলা তার শুকিয়ে গিয়েছিলো, তাই বিড়বিড় করে সে যা জবাব দিলো তা সকলে শুনতে পেলেন না।

কর্মকর্তাদের কেউ কেউ মন্তব্য করলেন : "ছেলেটা একটা আস্ত গাধা।" কেউ কেউ বললেন : "পেট ভরে খাওয়ানোর ফলে ছেলেটার মাথার ঘিলু মোটা হয়ে গেছে।"

মিঃ বাম্ব্‌ল এবার অলিভারের পেছনে দাঁড়িয়ে দু একটা কোঁৎকা দিলেন। ফলে অলিভার তার নুয়ে পড়া পা দুটো খাড়া করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো পরবর্তী প্রশ্নের জন্যে।

মিঃ লিম্ব্‌কিন্‌ আবার প্রশ্ন করলেন : "খোকা, তুমি বোধ হয় জানো যে তুমি একজন অনাথ ?"

"তাতে হয়েছে কি ?" অলিভার জবাব দিয়ে বসলো।

এবার হাসির রোল উঠলো সভার মাঝে। অলিভার যে নিরেট গাধা সে বিষয়ে কর্মকর্তাদের আর কোনো সন্দেহ রইলো না।

মিঃ লিম্ব্‌কিন্‌ অলিভারের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন : "তুমি নিশ্চয়ই জানো যে তোমার বাপ মা নেই বলে আমরা তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছি, তাই না ?"

কাঁদ-কাঁদ গলায় অলিভারের ছোট্ট জবাব শোনা গেল : "হ্যাঁ।"

মিঃ লিম্ব্‌কিন্‌ বললেন : "তোমাকে এবার শিখিয়ে পড়িয়ে কোনো কাজের লায়েক করে তোলার জন্যে এখানে আনা হয়েছে। কাল ভোর ছটা থেকে দড়ি পাকানোর কাজে লেগে যাবে, বুঝেচো ?"

অলিভারের মুখ দিয়ে আর কোনো জবাব বেরুলো না। মিঃ বাম্ব্‌ল অবশ্য আর দেরি না করে অলিভারকে টানতে টানতে একটা বড়ো হলঘরে নিয়ে এসে তারই এককোণে একটা ময়লা বিছানায় শুইয়ে দিলেন। অলিভার ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লো কেউ আর খোঁজ রাখলো না। খাবার জন্যে কেউ তাকে ডাকতেও এলো না।

ওদিকে কর্মকর্তারা সভা শেষ করার আগে অনাথ-আশ্রম পরিচালনার ব্যাপারে কতকগুলো নিয়মকানুনের গুরুতর রদবদল করলেন। তার মধ্যে একটা হলো অনাথ ছেলেদের খাওয়ার পরিমাণ বিষয়ে। কর্মকর্তারা সবাই

জ্ঞানী গুণী দার্শনিক লোক। তাঁরা অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলেন যে অনাথ ছেলেদের বেশী পরিমাণে খাবার দেওয়া হচ্ছে বলে তারা দিন দিন গাধা হয়ে যাচ্ছে, আর অকর্মার ঢেঁকি হয়ে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছে, তাই এবার থেকে খাওয়ার পরিমাণ এমনভাবে কমাতে হবে যাতে অনাথ ছেলেরা আশ্রমকে তাদের আড্ডাখানা করে তুলতে না পারে, আর খিদের জ্বালায় কাজকর্মের দিকে মন দিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা আশ্রমের খাবার জলের সরবরাহ বাড়িয়ে দিলেন, আর ছেলেদের মাথাপিছু রোজ তিনবারে তিন হাতা যবের ছাতুর তৈরি পাতলা লপ্‌সি, সপ্তাহে দুবার একটি ক'রে পিঁয়াজ এবং প্রতি রবিবারে আধখানা রুটি বরাদ্দ করলেন।

নতুন ব্যবস্থামতো খাবার দেবার ফলে অনাথ-আশ্রমের প্রথম প্রথম খরচ বেড়ে গেলো, কেননা অনাথ ছেলেরা না খেতে পেয়ে ধীরে ধীরে আরও লিকলিকে হওয়ার ফলে তাদের জামাগুলো বড্ডো বেশী ঢিলে হয়ে গেলো আর তাদের জামা পালটাতে বাড়তি খরচের ধাক্কা সইতে হলো। তাছাড়া অনাথ ছেলেরা বেশী সংখ্যায় মরতে লাগলো বলে অনেক খরচ হলো, কেননা একজনের কয়েক বছরের খাবার খরচের চেয়ে তাকে কবর দেওয়ার খরচ ছিলো বেশী। কর্মকর্তারা ছিলেন সবাই খাঁটী খ্রীশ্চান, তাই কবর দেওয়ার বদলে লাশগুলো তাঁরা জলে ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলেন না ধর্মনষ্ট হবার ভয়ে।

* * *

প্রথম তিনমাস অলিভার ও তার সঙ্গীরা মুখ বুজে সয়েছিলো অনাহারের জ্বালা। সকলেই খাবার সময়ে এক হাতা লপ্‌সি খেয়ে আঙুল চুষতো অনেকক্ষণ ধরে, আর ক্যাংলার মতো তাকিয়ে থাকতো লপ্‌সির হাতার দিকে, কিন্তু কারও সাহস হতো না আর-এক হাতা লপ্‌সি চাইতে। তারা ভালো করেই জানতো বাড়তি এক হাতা লপ্‌সি চাইলে তারা তো তা পাবেই না, উলটে পাবে কঠোর সাজা। তাই খিদের জ্বালায় তারা খাবারের থালা চেটে চেটে চক্‌চকে করে তুলতো। এর ফলে থালা ধোয়া-মোছার পাট ছিলো না তাদের।

ক্রমাগত না খেয়ে খেয়ে অনাথ ছেলেরা শেষে মাথা ঠিক রাখতে পারলো না। একদিন একটা ছেলে বললো—রোজ বাড়তি আর এক হাতা লপ্‌সি না পেলে সে হয়তো কোনোদিন মাঝ রাতে তার পাশে শোওয়া ঘুমন্ত ছেলেটাকে আস্ত চিবিয়ে খাবে। একথায় অন্য ছেলেরা সবাই ভয় পেয়ে গেলো। তারা তখন পরামর্শ করলো নিজেদের মধ্যে। শেষে ঠিক হলো তারা এবার এক হাতা বাড়তি লপ্‌সির জন্যে দাবি পেশ

করবে। এ ব্যাপারে অলিভারকেই তারা বেছে নিলো তাদের নেতা হিসেবে। অলিভারই সর্বপ্রথম এক হাতা বাড়তি লপ্‌সি চাইবে—তারপর ধীরে ধীরে বাকী সবাই এই দাবি নিয়ে এগিয়ে যাবে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা এক হাতা লপ্‌সি খেয়ে ছেলেরা নিয়মমতো আঙুল চোষার পরে থালা চাটতে লাগলো। অলিভার কিন্তু তা করলো না। সে এগিয়ে গিয়ে বাড়তি আর এক হাতা লপ্‌সি চেয়ে বসলো।

অনাথ-আশ্রমের দীর্ঘ-জীবনে কখনো কোনো ছেলে এরকম বেআইনী দাবি করেনি। পরিবেশক চমকে উঠলো। তখনি সে হাতার বাঁট দিয়ে অলিভারের মাথায় দু-চার ঘা বসিয়ে দিলো এবং তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে গিয়ে মিঃ বাম্ব্‌লকে জানালো : "সর্বনাশ হয়েছে! অলিভার এক হাতা লপ্‌সি বেশী চেয়েছে!"

মিঃ বাম্ব্‌ল চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন : "য়্যা! ছোঁড়াটা এক হাতা লপ্‌সি বেশী চেয়েছে! এতবড়ো আস্পর্ধা খুদে শয়তানটার! অকৃতজ্ঞ বেইমান কোথাকার।"

রাগে কাঁপতে থাকেন মিঃ বাম্ব্‌ল। বেতটা কাছে খুঁজে না পেয়ে অলিভারের দিকে তেড়ে গেলেন তিনি।

অলিভার কিন্তু ভয়ে পিছু হটলো না। বাড়তি এক হাতা লপ্‌সির দাবিতে সে অবিচল রইলো। তা দেখে মিঃ বাম্ব্‌লের মাথা আরও গরম হয়ে উঠলো। চোখ পাকিয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন : "বড়ো বাড় বেড়েছিস্ দেখছি! ফের যদি এ ধরনের কথা বলিস তো চাবকে সোজা করে দেবো!"

অলিভার তবুও ভয়ে কুঁকড়ে গেলো না বা মাথা নোয়ালো না দেখে মিঃ বাম্ব্‌ল এবার তার কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন আশ্রমের সভাপতি মিঃ লিম্ব্‌কিনের কাছে।

নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে বসে মিঃ লিম্ব্‌কিন্ তখন আধা-ঘুমের আমেজে ছিলেন।

"স্যার! এই ছোঁড়াটা এক হাতা লপ্‌সি বেশী চেয়েছে।" সখেদে বলে ওঠেন মিঃ বাম্ব্‌ল।

কথাটা কানে আসা মাত্রই মিঃ লিম্ব্‌কিনের ঘুমের নেশা ছুটে গেলো। চোখ কপালে তুলে তিনি ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন অলিভারের মুখের দিকে। প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে অলিভারের বিদ্রোহের মাত্রাটা কতখানি তা বোধ হয় প্রথমে যাচাই করে দেখলেন

তিনি। তারপর কিছুই যেন শোনেন নি বা বুঝতে পারেন নি এরকম একটা ভাব দেখিয়ে এক টিপ্ নস্যি নিয়ে মিঃ লিম্ব্‌কিন্ জিজ্ঞাসা করলেন : "কি বলছেন আপনি, মিঃ বাম্ব্‌ল ?"

মিঃ বাম্ব্‌ল জবাব দেন : "স্যার! এই পুচকে ছোঁড়াটা আশ্রমের নিয়মকানুন মানবে না বলছে—রোজ এক হাতা লপ্‌সি বেশী চাইছে।"

এ ধরনের জঘন্য অভিযোগ আজ পর্যন্ত পাননি মিঃ লিম্ব্‌কিন্ তাঁর সুদীর্ঘ আশ্রম-জীবনের কাজে, তাই নিজের কানকে যেন প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেন না তিনি। কথাটা সত্যি কিনা তা ভালো করে যাচাই করার জন্যে তিনি আবার মিঃ বাম্ব্‌লকে জিজ্ঞাসা করেন : "আপনি কি বলতে চাইছেন যে ওই ছেলেটা সত্যি সত্যি পুরো এক হাতা বাড়তি লপ্‌সি চেয়েছে ?"

—"তাইতো চেয়েছে ছোঁড়াটা।" জবাব দেন মিঃ বাম্ব্‌ল।

—"পুরো এক হাতা—" কথাটা শেষ করতে পারেন না মিঃ লিম্ব্‌কিন্। বিস্ময়ের রেশ ফুটে ওঠে তাঁর সুরে।

—"হ্যাঁ, স্যার! সিকি বা আধ হাতা নয়, পুরো এক হাতা লপ্‌সিই বেশী চেয়েছে।" কথাটা জোর দিয়ে বলেন মিঃ বাম্ব্‌ল।

—"ঠিক বলছেন তো?" আবার জিজ্ঞেস করেন মিঃ লিম্ব্‌কিন্।

—"হ্যাঁ, স্যার!" এবার ছোট্ট জবাব আসে মিঃ বাম্ব্‌লের কণ্ঠে।

একথা শুনে মিঃ লিম্ব্‌কিন্ সোজা হয়ে চেয়ারে বসলেন। মনে মনে বোধ হয় এতক্ষণ হিসেব করছিলেন রোজ পুরো এক হাতা বাড়তি লপ্‌সি দিলে আশ্রমের খরচের খাতে কত টাকা বাড়বে। হিসেব গুলিয়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ মেজাজে তিনি মিঃ বাম্ব্‌লকে আবার জিজ্ঞাসা করেন : "কেন ? ওদের কি আমরা কম খেতে দিচ্ছি ?"

এ প্রশ্নের জবাব দিতে যাচ্ছিলো অলিভার, কিন্তু তার কোঁকে কোঁৎকা মেরে মিঃ বাম্ব্‌ল থামিয়ে দিলেন তার ভাষা! সাফাইয়ের সুরে নিজেই বলে ওঠেন : "মোটেই তা নয়, স্যার। আপনারা সকলে এতো মাথা ঘামিয়ে অনাথ ছেলেদের জন্যে যা বরাদ্দ ঠিক করেছেন তা কখনো কম হতে পারে না। কোনোমতেই তাকে কম বলা যায় না—অন্ততঃ আমি নিজে তা স্বীকার করি না। বরং আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে ওদের খাবার বেশী দেওয়া হচ্ছে।"

—"খাবার বেশী দেওয়া হচ্ছে!" আর একটা পালটা অভিযোগ পেলেন বলে মনে হলো মিঃ লিম্ব্‌কিনের।

মিঃ বাম্ব্‌লের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন মিঃ লিম্ব্‌কিন্ বাহবার ভঙ্গিমা নিয়ে। মুখে তাঁর মৃদু হাসি ফুটে ওঠে এবার। সমস্যার সমাধান হয়তো খুঁজে পেয়েছেন তিনি এতক্ষণে।

এদিকে শীর্ণ ক্ষুধার্ত অলিভার ভয়ে কাঁপতে থাকে সভাপতির জাঁদরেল চেহারা ও তাঁর ভারিক্কি চাল দেখে। তার মুখে কোনো ভাষা বেরুলো না বটে মিঃ বাম্ব্‌লের মারের ভয়ে, তবে তার অন্তর বলতে থাকলোঃ "আপনাদের দয়ায় যেটুকু খেয়ে বেঁচে এখনও আছি তার জন্যে কৃতজ্ঞ, শুধু বাড়তি এক হাতা লপ্‌সি পেলে আরও কিছুদিন বাঁচবো।"

মিঃ বাম্ব্‌লের জবাবের জের তুলে মিঃ লিম্ব্‌কিন্ আবার জিজ্ঞাসা করেনঃ "তাহলে, মিঃ বাম্ব্‌ল, আপনি কি বলতে চান যে ছেলেটা আশ্রমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাইছে?"

মিঃ বাম্ব্‌ল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেনঃ "হ্যাঁ স্যার! এটা একটা ঘোরতর বিদ্রোহ। এর একটা হেস্তনেস্ত করা এখনি দরকার, নইলে শেষে আমরা কিছুতেই সামাল দিতে পারবো না।"

মিঃ লিম্ব্‌কিন্ বললেনঃ "তাহলে তো বিদ্রোহীকে কড়া সাজা দিতে হয়?"

মিঃ বাম্ব্‌ল জবাব দেনঃ "হ্যাঁ স্যার! এ ছোঁড়াটা হলো নাটের গুরু। একে সাজা না দিলে এর দেখাদেখি বাকী সকলে বিগড়ে যাবে, আর পরিণামে অনাথ ছেলেদের জন্যে আশ্রমের এতদিনের সৎ প্রচেষ্টা একেবারে বানচাল হয়ে যাবে।"

মিঃ বাম্ব্‌লের শেষ কথাটা শুনে মিঃ লিম্ব্‌কিন্ ঘাবড়ে যান। অনাথ-দরিদ্রদের সেবক তিনি। আজীবন সেবার আদর্শ ঘাড়ে নিয়ে আশ্রমের কঠোর কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। একটা ছেলের জন্যে অনাথ-আশ্রমের এতবড়ো ক্ষতি হবে এটা তিনি জেনেশুনে সইবেন কি করে? তা ছাড়া ছেলেদের বেশী খাবার দেওয়ার অভিযোগ পেয়েছেন মিঃ বাম্ব্‌লের কাছ থেকে।

অগত্যা কর্মকর্তাদের সভা ডেকে বসলেন মিঃ লিম্ব্‌কিন্ সে-রাতেই। সভার বিচার্য বিষয় হলোঃ "বাড়তি এক হাতা লপ্‌সি চেয়ে অলিভার টুইষ্ট নামে এক বালকের বিদ্রোহ ঘোষণা আশ্রমের বিরুদ্ধে।"

মিঃ লিম্ব্‌কিনের হুকুমে সেদিন থেকে অলিভারকে অন্ধকার সেল্‌-এ আটক রাখা হলো। অনেক ভেবেচিন্তে অনাথ-আশ্রমের কর্মকর্তারা শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন, অলিভারকে আশ্রম থেকে বিদায় করতেই হবে।

* * *

পরের দিন আশ্রমের সদর দরজায় একটা বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিলো: "কেউ যদি অলিভারকে নিজের কাজে লাগাবার জন্যে নিয়ে যায়, তবে তাকে পাঁচ পাউণ্ড দেওয়া হবে।"

এক সপ্তাহের মধ্যে কেউ এলো না এই জঘন্য অপরাধী-বালকের প্রার্থী হয়ে। নির্জন অন্ধকারে বন্দী-দশায় কেঁদে-কেঁদে আকুল হলো অলিভার।

সেদিন সকালবেলা চিম্‌নি-পরিষ্কারক গ্যাম্‌ফিল্ড্‌ যাচ্ছিলো আশ্রমের সামনে দিয়ে। তাকে তার বাড়িওলা ক'দিন ধ'রে বাকী ভাড়ার জন্যে ভারী তাগাদা দিচ্ছিলো। গ্যাম্‌ফিল্ড্‌ ভাড়ার টাকা যোগাড় করতে না পেরে খুব ভাবনায় পড়েছিলো। হঠাৎ আশ্রমের ওই বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ায় সে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। তখনি অনাথ-আশ্রমের কর্মকর্তাদের কাছে অলিভারকে নিজের সহকারী হিসেবে পাবার জন্যে আবেদন জানালো। অনেক দর-কষাকষির পরে কর্মকর্তারা তাকে পাঁচ পাউণ্ডের জায়গায় সাড়ে-তিন পাউণ্ড দিয়ে তার হাতে অলিভারকে সঁপে দিতে রাজী হলেন।

তারপর অলিভার আর গ্যাম্‌ফিল্ডকে নিয়ে মিঃ বাম্ব্‌ল গেলেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে—তাঁর অনুমতি ছাড়া অলিভারকে লাগানো যাবে না চিম্‌নি পরিষ্কার করার কাজে। কেন না, এর আগে এ-কাজ করতে গিয়ে কয়েকজন বালক দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু সব-কিছু বিগড়ে দিলো অলিভার। সে গ্যাম্‌ফিল্ডের চ্যাপটা-মুখে কি-যেন দেখে এমন ভয় পেলো যে, কিছুতেই তার সঙ্গে সে যেতে চাইলো না। ম্যাজিস্ট্রেটও তাই মত দিলেন না।

অলিভারকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে আবার অন্ধকার সেল্‌-এ আটকে রেখে দেওয়া হলো এবং পরদিন অনাথ-আশ্রমের সদর দরজায় আবার একটা বিজ্ঞাপন টাঙানো হলো: "অলিভারকে ভাড়া দেওয়া হবে এবং যে ভাড়া নেবে, তাকে পাঁচ পাউণ্ড দেওয়া হবে।"

অলিভারকে ভাড়া নেবার জন্যে কেউ এগিয়ে এলো না দেখে কর্মকর্তারা তাকে বিদেশে কোথাও ছোকরা চাকর হিসেবে পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করতে বললেন মিঃ বাম্ব্‌লকে। মিঃ বাম্ব্‌ল চলে গেলেন লণ্ডনে জাহাজী-ব্যাপারীদের কাছে, কিন্তু তাতে সফল হলেন না তিনি। আশ্রমে ফিরে আসার পথে তাঁর দেখা হলো মিস্টার সোয়ারবেরীর সাথে। মিঃ

হঠাৎ বাজনা থামিয়ে কেঁদে উঠল

সোয়ারবেরীর পেশা হলো—কফিন তৈরি করা ও লাশ কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

কথায় কথায় মিঃ বাম্ব্‌ল অলিভারের ব্যাপারে নিজের হয়রানির কথা মিঃ সোয়ারবেরীকে বললেন। নানা কারণে মিঃ বাম্ব্‌লের সাথে মিঃ সোয়ারবেরীর স্বার্থ জড়িত ছিলো, কেন না মিঃ বাম্ব্‌ল ছিলেন একজন পাদরী। পাদরীর সাহায্য পেলে কফিনের ব্যবসায় ভালোরকম পশার বাড়িয়ে তোলা যায়, তাই মিঃ বাম্ব্‌লকে খুশী করার জন্যে অলিভারকে নিতে মিঃ সোয়ারবেরী রাজী হয়ে গেলেন তখনি।

মিঃ বাম্ব্‌ল ছুটে গেলেন মিঃ লিম্ব্‌কিনের কাছে খবরটা দিতে। ঠিক হলো সেদিন সন্ধ্যার পর অলিভারকে পাচার করে দেওয়া হবে মিঃ সোয়ারবেরীর বাড়িতে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেদিন রাতেই মিস্টার বাম্ব্‌লের সাথে অলিভার হাজির হলো মিঃ সোয়ারবেরীর বাড়িতে। খোলা জানালা দিয়ে তাদের আসতে দেখে মিঃ সোয়ারবেরী বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠলেন : "অ গিন্নী, দয়া করে একবার বাইরে আসবে কি ?"

মিসেস্ সোয়ারবেরী বেরিয়ে এলেন। অলিভারকে দেখেই তিনি মন্তব্য করলেন : "ভারি ছোট যে !"

—"তা বটে," ব'লে মিঃ বাম্ব্‌ল এমনভাবে তাকালেন অলিভারের দিকে, যেন ছোটো হওয়ার জন্যে সে-ই দায়ী। তারপর বলেন মিঃ বাম্ব্‌ল : "ছোটো, তবে বড় তো হবে !"

—"তা হবে—গুণ আছে আমাদের দানাপানির, তবে আশ্রমের ছেলেদের দিয়ে যতটা কাজ পাওয়া যায়, তার চেয়ে খরচ হয় বেশী ওদের পুষতে।" বললেন মিসেস্ সোয়ারবেরী। তারপর অলিভারকে নিয়ে একটা সরু সিঁড়ি বেয়ে হাজির হলেন একটা অন্ধকার ভ্যাপসা রান্নাঘরে এবং তাকে কিছু বাসি মাংস খেতে দেবার জন্যে হুকুম করলেন পরিচারিকা শার্লটিকে।

মাংস! জিভে জল এলো অলিভারের। অনাথ-আশ্রমে ও-বস্তুটি কোনোদিন সে খেতে পায়নি। অলিভারের মাংস খাওয়া শেষ হ'লে

মিসেস্ সোয়ারবেরী ব'লে উঠলেন ঃ "য়্যাঁ! সবটা খেয়ে ফেল্লি!" ভবিষ্যতে অলিভারের খোরাক যে কি দাঁড়াতে পারে, মনে-মনে তার হিসেব ক'রে শিউরে উঠলেন তিনি।

মিসেস্ সোয়ারবেরী তারপর অলিভারকে দোকান-ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন ঃ "যা, ওই টেবিলটার তলায় গিয়ে ঘুমো। কফিনের পাশে ঘুমোতে ভয় করবে নাকি রে? তা', ভয় করলেও উপায় নেই—ওখানেই ঘুমোতে হবে তোকে।"

দোকান-ঘরের দরজা বন্ধ করে তার মধ্যে একলা শুয়ে চারদিকের কফিনগুলোর দিকে তাকিয়ে ভয়ে ঘামতে-ঘামতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো অলিভার।

ঘরের দরজায় দুড়ুম-দাড়াম লাথির আওয়াজ শুনে অলিভারের ঘুম ভাঙলো ভোরে। উঠে দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকলো একটা ধাড়ী ছেলে রুটি-মাখন খেতে-খেতে।

তাকে খরিদ্দার ভেবে অলিভার জিজ্ঞাসা করলো, "আপনার কফিন চাই নাকি?"

ছেলেটা এ-কথা শুনে ক্ষেপে গিয়ে বললো ঃ "ফের এ-রকম কথা যদি বলিস্ তো তোকেই কফিনে শোয়াবো! জানিস্, আমি হচ্ছি নোয়া ক্লেপোল্; তোর ওপরওয়ালা রে হতভাগা!" এই ব'লে সে একটা লাথি মারলো অলিভারকে।

এই সময় শার্লটি এলো সকালবেলার জলখাবার নিয়ে। নোয়ার জন্যে সে মনিবের খাবার থেকে চুরি ক'রে কিছু মাংস এনেছে, কিন্তু অলিভারের জন্যে এনেছে শুধু একবাটি চা।

জলখাবার খেতে-খেতে অলিভারের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করতে লাগলো নোয়া। শার্লটিকে বললো সে ঃ "হতভাগাটাকে দুনিয়ার সববাই দূর করে দিয়েছে, বাপ-মারও কোনো হদিশ্ মেলেনি।...হাঃ হাঃ!"

* * *

নোয়াও অনাথ-আশ্রমে মানুষ হয়েছে। তবে সে অলিভারের মতো অজ্ঞাত-কুলশীল নয়—তার মা ছিলো ধোপানী, তার বাপ ছিলো লড়াই-ফেরত বিকলাঙ্গ মাতাল সৈনিক। চিরকাল প্রতিবেশী বালকদের বিদ্রূপ চুপচাপ সয়ে এসেছে নোয়া। আজ নিজের চেয়েও হীন ও অসহায় একটি ছেলেকে নিজের কবজায় পেয়ে সে তার গায়ের ঝাল মেটাতে লাগলো।

শার্লটিও এবিষয়ে নোয়ার জুড়ি ছিলো। সেও অলিভারকে নানাভাবে

হেনস্থা করতে লাগলো। অনেক পোড়-খাওয়া ছেলে অলিভার। তাই নীরবে হাসিমুখে সব কিছু সইতে লাগলো সুদিনের আশায়।

এত নিপীড়নের মাঝে অলিভারের একটা সান্ত্বনা ছিলো যে তার মনিব তাকে মোটামুটি ভালো চোখেই দেখতেন। মিস্টায় সোয়ারবেরীর কাজের ঝক্কি-ঝামেলা বেশী। তাঁকে প্রায়ই এখানে-ওখানে ছোটাছুটি করতে হয় কবরের ব্যবস্থা করতে। ভালোভাবে কাজকর্ম করতে পারলে দু'চার পয়সা বাড়তি রোজগারও হয় তাঁর। তাই অলিভারকে মিঃ সোয়ারবেরী মাঝে মাঝে সঙ্গে নিয়ে যেতেন তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্যে। মনিবকে খুশী করার জন্যে অলিভারের আগ্রহ ছিলো আন্তরিক। তাই অতি অল্পদিনেই মিস্টার সোয়ারবেরী বুঝতে পারলেন যে অলিভার বাস্তবিকই কাজের ছেলে এবং তার ওপর ছোটোখাটো কাজের ভার দিয়ে নির্ভর করা যায়।

মাসখানেক পরে অলিভারের বিষয়ে গিন্নীকে বললেন মিস্টার সোয়ারবেরী: "বেশ দেখতে ছেলেটি! কেমন যেন একটা বিষাদের ছায়া আছে ওর মুখে!"

স্বামীর মুখে একথা শুনে মিসেস্ সোয়ারবেরী কিন্তু খুশী হলেন না। স্বামীর সব কথারই তিনি সমালোচনা করতেন কড়া ভাষায়, কাজেই অলিভারের ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম হলো না। অলিভারের বিষয়ে স্বামী যে বড় বাড়াবাড়ি করছেন একথা শুধু মনে করিয়ে দিলেন মিসেস্ সোয়ারবেরী।

মিস্টার সোয়ারবেরীর সুনজরে আসার ফলে তাড়াতাড়ি অলিভারের পদোন্নতি হয়ে গেলো। দোকানে যারা কফিন কিনতে আসতো, তাদের শবযাত্রায় শোক প্রকাশ করার জন্যে একজন লোক রাখতে হোত মিস্টার সোয়ারবেরীকে। তাতে কফিন বেচার সুবিধা হতো। অলিভার সেই পদটা পেয়ে গেলো।

কয়েক মাস ধ'রে নোয়ার অত্যাচার নীরবে সয়ে আসছিলো অলিভার। অলিভারের পদোন্নতিতে নোয়ার হিংসে আরো বেড়ে গেলো, তার ফলে তার অত্যাচারের মাত্রাও গেল বেড়ে।

* * *

একদিন রান্নাঘরে অলিভার ও নোয়া খাওয়ার জন্যে বসলো পাশাপাশি। তাদের পরিবেশন করবে শার্লটি, কিন্তু মনিবগিন্নীর ডাকে সাড়া দিয়ে সে কি একটা অন্য কাজে ব্যস্ত রইলো। এর ফলে অলিভার ও নোয়াকে খাবার টেবিলে অপেক্ষা করতে হলো খানিকক্ষণ।

সুযোগ-সুবিধে পেলেই নোয়া অলিভারের ওপর জোরজুলুম চালিয়ে নানাভাবে অত্যাচার করতো। সেদিনও তাই নোয়া অলিভারের পাশে চুপ করে বসে থাকতে পারলো না। অলিভারকে ক্ষেপাবার জন্যে খাবার টেবিলের ওপর নিজের ঠ্যাং তুলে দিলো নোয়া। অলিভার ওদিকে নজরই দিলো না। তাতে চটে গিয়ে নোয়া অলিভারের চুল ধ'রে হেঁচকা মেরে কান ম'লে দিলো। অলিভার তবু কাঁদলো না, কোনো প্রতিবাদ পর্যন্ত করলো না। তাতেও যখন অলিভারকে ক্ষেপাতে পারলো না নোয়া, তখন সে কুৎসিত ভাবে অলিভারকে প্রশ্ন করলো: "ওরে হতভাগা। তোর মায়ের খবর কি রে?"

অলিভার বললো: "তিনি মারা গেছেন—তাঁর সম্বন্ধে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না।"

অলিভারের চোখ দিয়ে জল গড়াতে দেখে নোয়া ব'লে উঠলো: "কি রে ছিচ্‌কাঁদুনে। কাঁদছিস্ কেন আবার?"

চট্ ক'রে চোখের জল মুছে ফেলে অলিভার বললে: "তোমার ভয়ে কাঁদিনি। কিন্তু খবরদার! আমার মায়ের সম্বন্ধে কখনও কোনো কথা ব'লো না।"

—"ইস্! ভয় দেখাচ্ছিস্ আমাকে শুয়োর? জানিস্ তোর মা ছিলো একটা বদ্ মেয়েমানুষ।" চেঁচিয়ে বলে ওঠে নোয়া।

—"কি বললে?" অলিভার নোয়ার দিকে মুখ তুলে তাকালো।

নোয়া আরও চেঁচিয়ে বললো: "তোর মা ছিলো বদ্ মেয়েমানুষ রে হতভাগা—একেবারে চরিত্তির খারাপ—মরেছে, আপদ্ গেছে!"

রাগে লাল হয়ে উঠে দাঁড়ালো অলিভার। তারপর চেয়ার টেবিল উলটে ফেলে, নোয়ার টুঁটি টিপে ধ'রে পাগলের মতো ঝাঁকানি দিতে লাগলো।

—"খুন করলে রে আমাকে! অ শার্লটি! অ গিন্নীমা! বাঁচান! আমাকে বাঁচান! অলিভার ক্ষেপে গেছে! শার্—লটি!" চেঁচিয়ে উঠলো নোয়া!

ছুটে এলেন মিসেস্ সোয়ারবেরী। তাঁর পেছনে পেছনে এলো শার্লটি।

—"তবে রে হতভাগা!" ব'লে শার্লটি ছুটে গিয়ে চেপে ধরলো অলিভারকে। তারপর "নে-মক-হারাম, খুনে···ডাকাত" বলতে-বলতে একনাগাড়ে কিল-চড়-ঘুষি চালাতে লাগলো তার মুখে-বুকে-পিঠে।

শার্লটির কবজীতে জোর কম ছিলো না, তবু পাছে তাতে তেমন কাজ

না হয়, তাই মিসেস্ সোয়ারবেরী নিজে এক-হাতে অলিভারকে চেপে ধ'রে অপর-হাতে খিমচে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিলেন তার সারা দেহ। এই সুযোগে নোয়াও পেছন থেকে অলিভারের কোঁকে ঘুষি চালাতে লাগলো।

মারতে-মারতে হাঁপিয়ে পড়লো সকলে। তখন সকলে মিলে অলিভারকে ধরে বেঁধে আটকে রাখলো কয়লা-কুঠরীতে। তারপর নোয়াকে হুকুম করলেন মিসেস্ সোয়ারবেরী ঃ মিস্টার বাম্ব্‌লের কাছে ছুটে যাও, নোয়া—এখনি যেন তিনি আসেন···এক মিনিটও দেরি কোরো না···যাও-যাও···চটপট যাও···টুপি নেবার দরকার নেই নোয়া।"

নোয়া তখন ছুটে গেলো মিঃ বাম্ব্‌লের কাছে।

নোয়ার হাবভাব দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন মিস্টার বাম্ব্‌ল। নিজের শরীরটা বান-মাছের মতো মোচড়াতে মোচড়াতে নোয়া তাঁকে জানালো যে, অলিভার আজ মিসেস্ সোয়ারবেরী, শার্লটি এবং তাকে খুন করতে চড়াও হয়েছিল। এ-কথা শুনে মিঃ বাম্ব্‌ল তখনই নোয়ার সঙ্গে মিঃ সোয়ারবেরীর বাড়িতে হাজির হলেন।

কয়লা-কুঠরীর বন্ধ-দরজায় লাথি মেরে মিঃ বাম্ব্‌ল হাঁক দিলেন ঃ "অলিভার !"

ভেতর থেকে অলিভার গর্জে উঠল ঃ "আগে দরজা খুলে দিন।"

মিস্টার বাম্ব্‌ল জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আমার গলা চিনতে পারছো ?"

—"খুব।"

—"তবু ভয় করছে না তোমার ?"

—"না।" বে-পরোয়া ভাবে জবাব দিলো অলিভার।

অলিভারের মুখ থেকে এ-রকম জবাব পাবার আশা করেন নি মিঃ বাম্ব্‌ল, তাই ঘাবড়ে গিয়ে দরজার কাছ থেকে স'রে এলেন।

মিসেস্ সোয়ারবেরী বললেন ঃ "নিশ্চয়ই ক্ষেপে গেছে, দেখছেন না ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো চোখ-মুখের চাহনি···নইলে এমনভাবে আপনার সাথে কথা বলবার হিম্মত হয় ওর।"

—"ক্ষেপে যায়নি, মিসেস্ সোয়ারবেরী,—এ হলো মাংস খাওয়ানোর ফল,—মাংস খেয়েই ওর এতখানি তেজ বেড়েছে।" বললেন মিস্টার বাম্ব্‌ল।

একথা শুনে মিসেস্ সোয়ারবেরী খেদ প্রকাশ করতে লাগলেন ঃ "হায় হায় ! ভালমানুষির এই ফল !"

মিঃ বাম্ব্‌ল বললেন ঃ "ওকে কয়েকদিন কিছু খেতে না দিয়ে কয়লা-কুঠুরীতে আটকে রাখুন। মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হলে তবে বাইরে বের করে রোজ এক হাতা লপ্‌সি খেতে দেবেন। ওর জান বড়ো কড়া—ওতে ও মরে যাবে না। ওর মতো ওর মায়ের জানও ছিলো বড়ো কড়া। ডাক্তার ও নার্স দুজনেই বলেছিলো, ওর মা যতোটা কষ্ট সয়ে বহু দূরের পথ হেঁটে এসেছিলো তার সামান্য একটুও ভদ্রঘরের কোনো মেয়ে সইতে পারত না।"

মিঃ বাম্ব্‌লের শেষের কথাগুলো শুনে অলিভার কুঠুরীর ভেতর দাপাদাপি শুরু করে দিলো।

এমন সময় মিস্টার সোয়ারবেরী বাড়ি ফিরে সব শুনলেন। তিনি কয়লা-কুঠুরীর দরজা খুলে অলিভারকে জামার কলার ধ'রে টেনে নিয়ে এলেন বাইরে। তারপর একটা ঝাঁকি দিয়ে সজোরে তার কানে একটা ঘুষি মেরে তিনি বললেন ঃ "এই বুঝি তোর ভালোমানষি? নোয়াকে মেরেছিস্ কেন?"

অলিভার শান্ত গলায় বললে ঃ "আমার কোনো দোষ নেই···ও আমার মাকে যা-তা গালাগাল দিয়েছে।"

মিসেস্ সোয়ারবেরী বললেন ঃ "দিয়ে থাকলেই-বা কি! সে যা বলেছে, তোর মা তো তাই ছিলো।"

—"না, ছিলো না।" প্রতিবাদ করলো অলিভার।

মিসেস্ সোয়ারবেরী জোর দিয়ে বললেন ঃ "ছিলো বৈকি!"

—"মিথ্যে কথা!" গর্জে উঠলো অলিভার।

একটা ছোট ছেলে, তা-ও আবার চাকর, তাঁর মুখের ওপর তাঁকে মিথ্যাবাদিনী বললো। মিসেস্ সোয়ারবেরী দুঃখে, অভিমানে কেঁদে ফেললেন।

স্ত্রীর চোখে জল দেখে মিস্টার সোয়ারবেরী ধৈর্য হারিয়ে ফেলে অলিভারকে এমন বেদম পিটলেন যে, মিসেস্ সোয়ারবেরী তাতে খুশী হলেন এবং মিস্টার বাম্ব্‌লের বেত চালাবার আর দরকার হলো না।

সেদিন রাতে একলা অন্ধকারে শুয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে কাঁদলো অলিভার। তারপর ঊষার প্রথম আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে নিজের সামান্য জামাকাপড়ের একটা পুঁটুলি ক'রে নিয়ে, ঘরের দরজা খুলে চুপি-চুপি সে বেরিয়ে পড়লো মিঃ সোয়ারবেরীর বাড়ি থেকে অজানা অচেনা পথে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অলিভার যখন মিঃ সোয়ারবেরীর বাড়ি থেকে পালালো, তখনো ভালো ক'রে দিনের আলো ফুটে ওঠেনি। অলিভার কয়েক পা এগোয়, আর পিছু ফিরে দেখে, কেউ তাড়া ক'রে আসছে কিনা। এভাবে ভয়ে-ভয়ে পথ চলতে-চলতে বেলা আটটার সময় পাঁচ মাইল পথ পেরিয়ে গেল সে। দুপুর পর্যন্ত একনাগাড়ে হাঁটার পর পথের পাশের-মাইল-স্টোনের পাশে সে বসে পড়লো। এতক্ষণে সে ওদের নাগাল থেকে পালিয়ে আর যাতে ধরা না পড়তে হয়, সেকথাই ভাবছিলো, কিন্তু এবার প্রথম ভাবতে শুরু করলো তার ভবিষ্যতের কথা—কোথায় গেলে ভালো হয়, আর কিভাবে বাঁচার চেষ্টা করবে।

যে মাইল-স্টোনের পাশে সে বসেছিলো, তাতে লেখা ছিলোঃ "লণ্ডন শহর এখান থেকে সত্তর মাইল দূরে।"

লণ্ডন শহরের নাম শুনেই বালক অলিভারের মনে নতুন সাড়া জাগলো। মস্ত বড়ো শহর সেটা—সেখানে গেলেই সে হারিয়ে যাবে বিশাল জনস্রোতে—কেউ, এমন কি মিঃ বাম্‌ব্‌লও তাকে খুঁজে পাবে না কখনো। তাছাড়া সে শুনেছে যে সেখানে নানা ধরনের কাজ পাবার উপায় আছে। এসব সাত-পাঁচ ভেবে সে আবার হাঁটা শুরু করলো।

সে মনে মনে ঠিক করলোঃ "হোক্ সত্তর মাইল দূরে, সে পায়ে হেঁটেই লণ্ডনে যাবে।"

পাঁচ মাইল হাঁটার পর সে আবার বসে পড়লো। তার ছেটো পুঁটলীর মধ্যে একটুকরো রুটি, একটা কোরা জামা আর দু জোড়া মোজা ছিলো। তাছাড়া তার কাছে একটা পেনিও ছিলো—ওটা সে কাউকে কবর দেবার পর দান হিসাবে পেয়েছিলো। কিন্তু এই শীতের দিনে আরও প্রায় পঁয়ষট্টি মাইল হাঁটবে কিভাবে তা ভেবেই সে শিউরে উঠতে লাগলো।

সেদিন অলিভার মোট কুড়ি মাইল পথ হাঁটলো। নিছক মনের জোরে। খেতে পেয়েছিলো শুধু সেই রুটিখানা, আর রাস্তার পাশের কুয়োর জল। রাতের আঁধার নেমে এলে সে খোলা মাঠের মাঝে একটা খড়ের গাদায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন সকালে খিদেয় তার নাড়ী জ্বলতে লাগলো। বাধ্য হয়ে পেনীর বদলে একটা ছোটো পাঁউরুটি যোগাড় করে কোনোরকমে পেটের জ্বালা খানিকটা কমালো।

তারপর আবার হাঁটা শুরু করলো। সেদিন সে মোট বার মাইল পথ হাঁটলো। তার পা দুটো এবার ভীষণ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে কাঁপতে লাগলো। তবুও তার পথ চলার বিরাম নেই। পরের দিন হাঁটা শুরু করার সময় তার পা ফেলার ক্ষমতা ছিলো না বললেই হয়।

একটা ছোটো পাহাড়ের তলায় সে একটা গাড়ীকে আসতে দেখলো। তাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে পাহাড়ের চড়াইটা পার করে দেবার জন্যে সে অনেক অনুরোধ করলো, কিন্তু তার কথায় কেউ কান দিলো না। গাঁয়ের মাঝ দিয়ে চলার সময় অলিভারের সবচেয়ে মূশকিল হলো কুকুরগুলোর জন্যে। তাদের তাড়ায় কোনো গাঁয়ে বসার উপায় ছিলো না তার। একে সে অপরিচিত, তার ওপর দীনহীন ছেঁড়া পোশাকে তাকে দেখে গাঁয়ের ছেলেরা তাকে চোর মনে করে কুকুর লেলিয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে তাড়া করলো।

তাছাড়া বড়ো বড়ো সাইন-বোর্ডে লেখা ছিলো যে, যদি কেউ ভিক্ষা করে তবে তাকে জেলে পাঠানো হবে। এর ফলে না খেয়ে মরলেও সে হাত পাততে সাহস করলো না।

একটা দয়ালু বুড়ী এবং একজন গেট-কীপারের অযাচিত সাহায্যের জন্যে অলিভার সেযাত্রা বেঁচে গেলো, নইলে তাকে রাজপথেই প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়তে হতো। এভাবে সাতদিন পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে ভোর-বেলায় অলিভার এসে ঢুকলো বার্নেট্ শহরে। তখন তার পায়ে এমন ব্যথা যে, সে পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলো না—তাকে খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছিলো। একটা বাড়ির দরজায় চুপ করে ব'সে পড়লো সে—কারও কাছে ভিক্ষা চাইবার প্রবৃত্তিও তার হলো না।

এমন সময় অদ্ভুত-চেহারার একটা ছেলে তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। ছেলেটার পরনে ঢিলেঢালা ছেঁড়া-ময়লা পোশাক আর তার মুখটা কেমন যেন তুবড়ে গেছে। অলিভারকে পা থেকে মাথা অবধি খুঁটিয়ে ভাল ক'রে দেখে নিয়ে সে ব'লে উঠলো: "ওরে ছোঁড়া, তোর বাড়ি কোথা রে?"

অলিভার বললো: "বাড়ি নেই!"

ছেলেটা দরদ দেখিয়ে বললো: "বুঝেছি···পেটে দানাপানিও কিছু জোটেনি তো?"

অলিভারের চোখ ছল্‌ছল্ ক'রে উঠলো। বললো: "না···খিদেয় আর দাঁড়াতে পারছি নে।"

—"আয় আমার সঙ্গে···দুঃখ করিস্ নে···আমি তোর সব ভার নিচ্ছি···আয়"—এই বলে ছেলেটা অলিভারের হাত ধ'রে নিয়ে চললো। যেতে-যেতে সে একটা সরাইখানায় ঢুকে কিছু রুটি-মাংস কিনে অলিভারকে খাওয়ালো। খাওয়া শেষ হ'লে কথায়-কথায় ছেলেটা জানতে পারলো যে, অলিভার একজন সর্বহারা—শূন্য পকেটে চলেছে লণ্ডনে—সেখানে তার থাকা-খাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

অলিভারের পিঠ চাপড়ে মুরুব্বীর মতো বললো ছেলেটাঃ "ভয় নেই রে···আমি তোকে লণ্ডনে বিনি পয়সায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দেবো।"

কৃতজ্ঞতায় অলিভারের মন ভরে উঠল।

* * *

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে অলিভার তার সেই নতুন-চেনা বন্ধু জ্যাক্ ডকিন্স ওরফে 'ধুরন্ধর'-এর সঙ্গে লণ্ডনে প্রবেশ করলো। অতি সরু নোংরা গলিপথ দিয়ে চলতে চলতে ফিল্ড্ লেনের কাছাকাছি একটা ভাঙা বাড়িতে অলিভারকে নিয়ে ঢুকে পড়লো ধুরন্ধর। ঢুকেই বাড়ির দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে খুব জোরে শিস্ দিলো। বাড়ির ভেতর থেকে সাড়া এলোঃ "কে?"

জবাব দিলো ধুরন্ধরঃ "কুমড়োপটাস্।"

এটা একটা সংকেত-বাক্য ব'লে মনে হলো অলিভারের। কেননা, সঙ্গে-সঙ্গে গলির অপর দিকে মোমবাতির একটা ফিকে আলো জ্বলে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে একজন পুরুষের মুখ উঁকি মারলো। পুরুষটা জিজ্ঞাসা করলোঃ "সঙ্গে কে?"

ধুরন্ধর অলিভারকে সামনে ঠেলে দিয়ে বললোঃ "নতুন বন্ধু··· গ্রীন্‌ল্যাণ্ড থেকে আসছে। ফ্যাগিন্ ওপরে আছে কি?"

—"আছে।" জবাব এলো ওধার থেকে।

ধুরন্ধরের হাত ধ'রে ভাঙা নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলো অলিভার। নিচু ছাদওলা অতি পুরোনো নোংরা একখানা ঘর। বাজে-কাঠের টেবিলের ওপরে বোতলের মধ্যে একটা মোমবাতি জ্বলছে। টেবিলের ওপরে গোটাকয়েক মসলার পাত্র, একটুক্‌রো পাঁউরুটি, কিছু মাখন আর একখানা ছুরি। জ্বলন্ত উনুনের ওপরে সস্‌প্যানে কি-যেন ছেঁচকি ভাজা হচ্ছে, তার কাছে খুন্তি-হাতে চামড়া ঝুলে-পড়া একজন বুড়ো ইহুদী দাঁড়িয়ে আছে। একটা আলনায় একরাশ রেশমের রুমাল ঝুলছে।

পুরনো চট দিয়ে ঘরের মধ্যে কয়েকটা বিছানা পাতা। টেবিলের চারপাশে ব'সে কতকগুলো ছেলে পাইপ টানছে আর মদ খাচ্ছে—তাদের কারুর বয়সই ধুরন্ধরের চেয়ে বেশী নয়।

ধুরন্ধর বুড়ো ইহুদীকে ফিসফিস ক'রে কি যেন বললো। তারপর অলিভারকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে বললো ঃ "ফ্যাগিন্, এ আমার বন্ধু—অলিভার টুইষ্ট।"

ফ্যাগিন্ আর তার দলের ছেলেরা অলিভারকে সাদরে বরণ করলো। কিছু খাবার খেয়ে চটের বিছানায় শুতে-না-শুতেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লো অলিভার।

অলিভারের ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়। ঘুম ভাঙার পরও সে ঘাপটি মেরে শুয়ে রইলো চোখ বুজে। মাঝে-মাঝে চোখ পিট্ পিট্ করে ঘরের চারদিকে নজর দিয়ে দেখলো, ঘরে ফ্যাগিন্ ছাড়া আর কেউ নেই। ফ্যাগিন্ তখন একলা ব'সে কফি তৈরি করার জন্যে উনুনে সস্‌প্যান্ বসাচ্ছিলো। কিছুক্ষণ পরে অলিভারের নাম করে কয়েকবার ডাকলো তাকে ফ্যাগিন্, কিন্তু সে সাড়া শব্দ না দিয়ে মরার মত পড়ে রইলো। ফ্যাগিন্ ভাবলো—অলিভার নিশ্চয়ই এখনো অকাতরে ঘুমিয়ে আছে, তাই এই অবসরে তার অলক্ষ্যে নিজের জরুরী কাজটা সেরে ফেলবে সে।

ভোরে দলের ছেলেরা বাইরে বেরিয়ে গেলে রোজই ফ্যাগিন্ ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপিচুপি একলা বসে তার এই জরুরী কাজটা সেরে ফেলে কেউ ঘরে ফিরে আসার আগে। আজ অলিভার ঘরের মধ্যে আছে বলে তার অসুবিধা হচ্ছে ও-কাজটা সেরে ফেলতে। কিন্তু অলিভার এখনও ঘুমোচ্ছে মনে করে সে নিশ্চিন্ত মনে ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঠের মেঝে সরিয়ে একটা ছোটো খুপরীর ভেতর হাত ঢুকিয়ে বের করলো নানা চোরাই মাল। হিসেব করে সে দেখলো—সেগুলো সব ঠিক্ ঠিক্ আছে কি না। যেসব ছেলেদের সে আশ্রয় দিয়েছে নিজের ঘরে, তাদের তো পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। কখন কে হাত সাফাই করবে তার ঠিক কি ?

অলিভার পাশ ফিরে আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো—ফ্যাগিন্ কতকগুলো সোনার ঘড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। তাছাড়া আরও কতো রকমের নাম-না-জানা গয়না ছড়িয়ে রয়েছে তার চারপাশে। সেগুলো সে একটার পর একটা দেখছে আর বিড়বিড় করে কি বলছে, আর বাইরের সামান্য শব্দ শুনেই তার কান খাড়া হয়ে উঠছে। হিসেব শেষ করে ফ্যাগিন্ চোরাই মালগুলো আবার যথাস্থানে রেখে দিলো। এবার সে রুটি-কাটা বড়ো

ছুরিটা হাতে তুলে নিতেই অলিভার ভয়ে আঁতকে উঠলো। ফ্যাগিনের নজর এড়াতে পারলো না সে। ছুটে গিয়ে ফ্যাগিন্ ঘাড় ধরে অলিভারকে বিছানা থেকে তুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "ঠিক্ করে বল্—কতক্ষণ ঘুম থেকে উঠেছিস্ ?" ঘুম-জড়ানো সুরের ভান করে অলিভার বললো : "এই মাত্র।"

ফ্যাগিন্ আবার মেজাজ দেখিয়ে বলে : "ঠিক বলছিস্ তো ? আমার সাথে ধোঁকাবাজি করলে কিন্তু তোর ভাল হবে না বল্‌ছি !"

অলিভার উদাসভাবে জবাব দেয় : "মিছে কথা কখনো বলিনে আমি।"

ফ্যাগিন্ এবার একটু নরম হয়ে বললো : "আচ্ছা, তোর কথা বিশ্বাস করছি। এবার উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নে।"

সেদিন নেহাত বুদ্ধির জোরে অলিভার বেঁচে গেলো ফ্যাগিনের হাত থেকে—নইলে হয়তো তার লাশ ভেসে উঠতো নদীর বুকে।

অলিভার হাত-মুখ ধুয়ে ফ্যাগিনের কথামতো ঘর সাফ করছে, এমন সময় সেখানে এলো ধুরন্ধর—সঙ্গে আছে চার্লি বেট্‌স। গত রাতে চার্লিকে এই ঘরে পাইপ টানতে দেখেছে অলিভার।

মাংস, মাখন আর কফি নিয়ে চারজনে খেতে বসলো। খেতে-খেতে অলিভারের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে ধুরন্ধরকে প্রশ্ন করলো ফ্যাগিন্ : "সকালে কাজে বেরিয়ে কিছু পেয়েছো কি সোনার চাঁদেরা ?"

ধুরন্ধর বললো : "দু'খানা পকেট-বই।" এই ব'লে সে দু'খানা পকেট-বই বের করলো—একখানা লাল, অপরখানা সবুজ।

ফ্যাগিন্ সেগুলো খুলে ভালো করে পরীক্ষা ক'রে বললো : "এগুলো তেমন ভারী নয়, তবে খুব চমৎকার বাঁধাই—কি বলো অলিভার ?"

অলিভার সায় দিলো : "সত্যি, ভারী চমৎকার।" এ-কথা শুনে চার্লি হো-হো ক'রে হেসে উঠলো—অলিভার তো অবাক্।

চার্লি জানালো যে, সে পেয়েছে খানকয়েক রুমাল শুধু ! এই ব'লে সে চারখানা রুমাল বের ক'রে দিলো। ফ্যাগিন্ সেগুলো পরীক্ষা ক'রে বললো : "জিনিসগুলো মন্দ নয়। তবে মার্কা দেওয়া দেখছি। মার্কাগুলো তুলে ফেলতে হবে। ছুঁচ দিয়ে কেমন ক'রে মার্কা তুলতে হয়, তা আমরা অলিভারকে শিখিয়ে দেবো। কি বলো অলিভার, য়্যাঁ ?—হাঃ হাঃ হাঃ !"

এমন সময় সেখানে এলো ন্যান্‌সি আর বেট্ নামে দু'জন তরুণী। তাদের মাথায় একগাদা এলোমেলো চুল। মুখে তারা রঙ মেখেছে প্রচুর। তেমন

সুন্দরী না হলেও দু'জনেই বেশ মোটাসোটা আর হাসিখুশী তাদের চেহারা।

কিছুক্ষণ বসে থাকার পর তাদের মদ খেতে দেওয়া হলো। তারপর চার্লি যেই জানালো যে, ক্ষুরে 'প্যাড' লাগাবার সময় হয়েছে, অমনি চার্লি, ধুরন্ধর ও মেয়ে দু'জন ফ্যাগিনের কাছ থেকে খরচের টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

অলিভার তার নতুন আস্তানার ভাব-গতিক কিছুই বুঝতে পারে না। তাকে রেশমের রুমাল থেকে মার্কা তুলে ফেলার কায়দা শেখানো হয়েছে। ঘরে ব'সে সে সেকাজ করে। আর মনে মনে ভাবে, কোথা থেকেই বা রোজ এত রেশমের রুমাল আসে! কেনই-বা তার মার্কাগুলো তুলে ফেলা হয়! কাজের ফাঁকে নিরালা অবসরে বাইরের ফাঁকা বাতাস আর বাঁধন-খোলা জীবনের জন্যে মন তার হাঁপিয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু বুড়ো ফ্যাগিন্ তাকে ঘরের বাইরে যেতে দেয় না।

* * *

অবশেষে একদিন অনুমতি পেয়ে সে চার্লি ও ধুরন্ধরের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পড়লো। বেরুবার সময় তার সঙ্গীরা তাকে খোলাখুলি জানিয়ে দিলো, যা চোখে দেখবে, তা নিয়ে কোনো কথা যেন সে না বলে! অলিভার অবাক্ হয়ে দেখলো, পথের ধারের দোকানগুলো থেকে বহু আপেল আর পেঁয়াজ চুরি ক'রে পকেট বোঝাই করলো চার্লি। তার পকেটগুলোতে এত জিনিস ধরে যে, মনে হচ্ছিলো তার সারা জামাটাই যেন পকেট!

একটা সরু গলির মুখে ধুরন্ধরকে হঠাৎ থেমে পড়তে দেখে অলিভার জিজ্ঞাসা করলোঃ "কি হলো?"

ধুরন্ধর বললোঃ "চুপ্! ওই লোকটাকে দেখতে পাচ্ছো। ওই যে বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে!"

—"রাস্তার ওপারে ওই বুড়ো ভদ্রলোক তো? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি ওঁকে।" অলিভার বললো।

—"বেশ মোটা মাল!" মন্তব্য করলো চার্লি বেট্স্।

চার্লি ও ধুরন্ধর রাস্তা পার হয়ে ভদ্রলোকের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। অলিভার এখন কি করবে তা বুঝতে না পেরে তাদের পেছনে-পেছনে কয়েক পা এগিয়ে গেল।

বুড়ো ভদ্রলোক একখানা বই নিয়ে একমনে পড়ছিলেন। অলিভার দেখলো, হঠাৎ ধুরন্ধর একটা হাত ঢুকিয়ে দিলো বুড়ো ভদ্রলোকের পকেটে

—তারপর একখানা রেশমের রুমাল হাতিয়ে নিয়ে চালান ক'রে দিলো চার্লির কাছে। তারপর দু'জনে মিলে ছুটে পালাতে লাগলো প্রাণপণে। এতদিন পরে অলিভার বুঝতে পারলো, কোথা থেকে কিভাবে ফ্যাগিনের ঘরে রোজ এত রেশমের রুমাল আসে। এরা তাহলে চোর পকেটমার! ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল অলিভার। সেও প্রাণপণে ছুটে পালাতে লাগলো।

ঠিক এমনি সময়ে পকেটে হাত দিতেই বুড়ো ভদ্রলোক টের পেলেন যে, তাঁর রেশমের রুমাল খোয়া গেছে। পেছনে ফিরে তাকাতেই তিনি দেখলেন, একটা ছোটো ছেলে ছুটে পালাচ্ছে। বুড়ো ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন—"চোর! চোর! ধর! ধর!"

অমনি সারা রাস্তার লোক "চোর চোর—ধর ধর" ব'লে চেঁচাতে লাগলো! ধুরন্ধর ও চার্লি পাকা চোর। তারা জানতো যে এ-সময়ে ছুটলে লোকে তাদেরই চোর বলে ভাববে। তাই তারা দু'খানা বাড়ি পেরিয়ে গিয়েই থেমে পড়লো। কিন্তু অলিভার তখনও সমানে ছুটে চলেছে। এর জন্যে সবাই তাকে চোর মনে ক'রে তার পেছনে ধাওয়া করলো।

খানিকটা দূরে যেতে না যেতেই ধরা পড়লো অলিভার। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো সে রাস্তার ওপর। সবাই তাকে দেখার জন্যে ঘিরে দাঁড়ালো। চারদিকে রব উঠলো—'স'রে দাঁড়াও', 'বাতাস ছেড়ে দাও', 'হ্যাঃ, ওর আবার বাতাস', 'কই, সে ভদ্রলোক কই', 'ওই যে আসছেন উনি—ভদ্রলোককে পথ ছেড়ে দাও', ইত্যাদি।

বুড়ো ভদ্রলোক ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে অলিভারকে দেখে বললেন: "হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এই ছেলেটিই। ইস্—প'ড়ে গিয়ে ভারী আঘাত পেয়েছে তো!"

—"পড়ে যায়নি···আমি মেরেছি···এই দেখুন, কবজিটা আমার ছড়ে গেছে মারতে গিয়ে" বলতে-বলতে একটা চোয়াড়ে-ধরনের লোক এগিয়ে এসে বুড়ো ভদ্রলোককে সেলাম ঠুকে দাঁড়ালো কিছু পুরস্কার পাবার আশায়।

ব্যাপারগতিক দেখে বুড়ো ভদ্রলোক তখন পালাতে পারলে বাঁচেন। কিন্তু গোলমাল দেখে পুলিশের লোক তখন এসে পড়েছে···বুড়ো ভদ্রলোকের আর স'রে পড়া হলো না। পুলিশ অলিভারকে মাটিতে প'ড়ে থাকতে দেখে বুটের ঠোক্কর মেরে ব'লে উঠলো: "পাজী, শয়তান!" তারপর অর্ধ-অচেতন অলিভারকে নির্মমভাবে টেনে নিয়ে চললো তারা। বুড়ো ভদ্রলোককেও বাধ্য হয়ে তাদের সঙ্গে যেতে হলো।

অলিভার আর বুড়ো ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ 'মাটন্ হিল' আদালতে গিয়ে হাজির হলো। একজন গাঁট্টাগোট্টা গুঁফো দারোগা জানালেন যে, বুড়ো ভদ্রলোককেও এক মিনিটের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হ'তে হবে। তারপর দারোগাসাহেব অলিভারকে হাজতে পুরে তার দেহতল্লাশী করলেন, কিন্তু কিছু না পেয়ে তাকে আটকে রেখে দিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হয়ে বুড়ো ভদ্রলোক তাঁর নামের কার্ড টেবিলের ওপর রেখে বললেন: "এতে আমার নাম ঠিকানা আছে, হুজুর।"

ম্যাজিস্ট্রেট্ ফ্যাঙ্গের মেজাজ সেদিন খুব বিগড়ে ছিল! কিছুদিন আগে একটা মোকদ্দমায় তিনি যে রায় দিয়েছিলেন, সে নিয়ে একটা প্রবন্ধে স্থানীয় দৈনিক কাগজে জোরালো সমালোচনা বেরিয়েছে। ওই প্রবন্ধে লেখা হয়েছে: 'এই নিয়ে তিনশো বার স্বরাষ্ট্র-সচিবের নজরে আনা হলো ম্যাজিস্ট্রেট্ ফ্যাঙ্গের বিরুদ্ধে।' বুড়ো ভদ্রলোককে যখন তাঁর সামনে হাজির করা হলো, তখন ফ্যাঙ্গ সেই প্রবন্ধটাই পড়ছিলেন চোখমুখ লাল করে। রেগে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "কে তুমি?"

বুড়ো ভদ্রলোক টেবিলের ওপর রাখা তাঁর নাম-ঠিকানা লেখা কার্ডটা এগিয়ে দিতেই ম্যাজিস্ট্রেট্ খবরের কাগজ দিয়ে সেটা মেঝেতে ঠেলে ফেলে দিয়ে বললেন: "ইনস্পেক্টর, লোকটা কে?"

বুড়ো ভদ্রলোক গম্ভীর-কণ্ঠে বললেন: "আমার নাম, হুজুর, ব্রাউন্‌লো! কিন্তু যে-ম্যাজিস্ট্রেট্ একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে অকারণে এমন অপমান করেন, তাঁর নাম জানতে পারি কি?"

হাতের কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দারোগাকে জিজ্ঞাসা করলেন ফ্যাঙ্গ্: "এ লোকটার বিরুদ্ধে নালিশ কিসের?"

দারোগা জানালেন যে, নালিশ মিঃ ব্রাউন্‌লোর বিরুদ্ধে নয়—তিনিই নালিশ করতে এসেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট্ তখন মিঃ ব্রাউন্‌লোকে হলফ করার জন্যে হুকুম দিলেন দারোগাকে।

বিচার শুরু হলো। মিঃ ব্রাউন্‌লো অনেক ক'রে বললেন যে এই ছেলেটি তাঁর রেশমের রুমাল নিয়েছে কিনা, সে-কথা তিনি জোর দিয়ে বলতে পারেন না এবং ইতিমধ্যে সে যা সাজা পেয়েছে, তা যথেষ্ট হয়েছে। অলিভার তো কাঠগড়ায় উঠেই বেহুঁশ হয়ে প'ড়লো। তখন দারোগার জবানবন্দী নেওয়া হলো। তিনি অলিভারের নাম পর্যন্ত জানেন না—নিজের

মন-গড়া নাম দিলেন, 'টম হোয়াইট্'। মাত্র এটুকু শুনেই ম্যাজিস্ট্রেট্ অলিভারকে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম দিলেন।

পুলিশ বেহুঁশ অলিভারকে জেলে নিয়ে যাচ্ছিলো, এমন সময় আদালতে ঢুকলো সেই বইয়ের দোকানদার, যার দোকান থেকে মিঃ ব্রাউন্‌লো বই কিনেছিলেন। সে ম্যাজিস্ট্রেট্‌কে বললো ঃ "ওই ছেলেটা রেশমের রুমাল চুরি করেনি, আর ও সবসময় মিঃ ব্রাউন্‌লো থেকে বেশ খানিকটা তফাতে ছিলো—চুরি করেছে অপর একটা ছেলে। চুরি করতে দেখে ওই ছেলেটা হতবাক্ হয়ে খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে পরে ভয়ে ছুটে পালালো।"

ফ্যাঙ্গের মেজাজ আগে থেকেই বিগড়ে ছিলো। বইয়ের দোকানদারের এ কথায় বেশ চটে গিয়ে ঝাঁঝিয়ে বলে উঠলেন তিনি ঃ "এতক্ষণ একথা আমাকে বলোনি কেন ?"

বইয়ের দোকানদার জবাব দিলো ঃ "হুজুর আগেই আসতাম আমি আপনার কাছে, কিন্তু নিজের দোকান ছেড়ে চট্ করে আসতে পারিনি।"

ফ্যাঙ্গের জেরার চোটে এও জানা গেলো যে, মিঃ ব্রাউন্‌লো একখানা বই নিয়ে এসেছেন তার দোকান থেকে, কিন্তু এ ঘটনার জন্যে তাড়াহুড়োয় বইখানার দাম দিয়ে আসেননি। একথা শুনে ফ্যাঙ্গ্ কড়া ভাষায় ব্যঙ্গ করলেন মিঃ ব্রাউন্‌লোকে। তাতে মিঃ ব্রাউন্‌লো ভারী লজ্জিত হয়ে পড়লেন।

বইয়ের দোকানদারের সাক্ষ্যের ফলে রেহাই পেলো অলিভার জেল খাটার দায় থেকে।

মিঃ ব্রাউন্‌লো এবং বইয়ের দোকানদার একসঙ্গে আদালত থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন, অলিভার প'ড়ে আছে রাস্তার ওপর বেহুঁশ হয়ে। তার জামাটা ছিঁড়ে খান্‌খান্ হয়ে গেছে। কে যেন তার মাথায় প্রচুর জল ঢেলে দিয়েছিলো। মৃতপ্রায় বালক অলিভারের সাদা মুখ দেখে মিঃ ব্রাউন্‌লো আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তখনি গাড়ি ডেকে অলিভারকে তুলে নিয়ে নিজের বাড়িতে চললেন। বইয়ের দোকানদারও তাঁর সাথে চলল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অনেক দিন পরে অলিভার যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল! অত্যন্ত দুর্বল, রোগা আর রক্তহীন হয়ে গেছে সে। কোনোরকমে বালিশ থেকে

মাথা তুলে কনুইয়ে ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে চারদিকে তাকিয়ে চিঁহি গলায় প্রশ্ন করলো : "আমি কোথায় ? এ ঘরে তো ঘুমোইনি আমি !"

এক বৃদ্ধা একখানা চেয়ারে তার পাশে বসে ছিলেন। অলিভারকে কথা বলতে দেখে তিনি বললেন : "চুপ করো। কথা কইলে আবার তুমি বেহুঁশ হয়ে পড়বে। শুয়ে পড়ো এবার।"

এই ব'লে বৃদ্ধা অলিভারের বালিশ ঠিক ক'রে তাকে শুইয়ে দিয়ে তার মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। অলিভার নিজের শীর্ণ দুর্বল হাত বাড়িয়ে বৃদ্ধার হাতখানা কাছে টেনে নিয়ে এলো কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যে। বৃদ্ধা জল-ভরা চোখে ব'লে উঠলেন : "বাছা আমার !"

অলিভার বিছানায় শুয়ে নিজের মায়ের কথা ভাবতে লাগলো। নিজের মাকে সে কখনো দেখেনি, তবুও নিজের মার ছবি একটা কল্পনা করে নেয় সে। ভাবে, তার মা যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে নিশ্চয়ই এই বৃদ্ধার মতো মাথার শিয়রে বসে দিনরাত সেবা করতেন।

বৃদ্ধাকে সে খুলে বলে তার মনের কথা। সে বলে : "তার মনে হচ্ছে, তার মা যেন করুণাভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে পাশে বসে আছেন।"

এ কথার জবাবে বৃদ্ধা আর কি বলবেন ? চোখের জল মুছে তিনি অলিভারকে একটু ঠাণ্ডা শরবত খাইয়ে দিলেন। অলিভার আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

তিন দিন পরে অলিভার একটু উঠে বসতে সমর্থ হলো।

অলিভারকে ইজিচেয়ারে করে বৃদ্ধা এবার নিজের ঘরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন। ধীরে ধীরে অলিভারকে সুস্থ হ'তে দেখে বৃদ্ধা আনন্দে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। অলিভার বললো : "আপনি কাঁদছেন কেন ?"

—"ও কিছু নয় বাবা, আনন্দে কাঁদছি, আর কাঁদবো না।" ব'লে তিনি চোখ মুছে ফেললেন।

অলিভার বললো : "আমার প্রতি অশেষ দয়া আপনার !"

বৃদ্ধা বললেন : "ওকথা বলো না। এখন সুরুয়া খেতে হবে তোমাকে। শরীরটা তাজা ক'রে নাও। ডাক্তারবাবুর কাছে শুনলুম, মিস্টার ব্রাউন্‌লো আজ সকালে তোমাকে দেখতে আসতে পারেন।"

সস্‌প্যানে ক'রে সুরুয়া গরম করতে করতে বৃদ্ধা নজর করলেন যে, অলিভার দেয়ালে টাঙানো একখানা তৈলচিত্রের দিকে গভীর মনোযোগ

দিয়ে তাকিয়ে আছে। কৌতূহলী হয়ে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন : "তুমি কি ছবি দেখতে ভালোবাসো ?"

অলিভার বললো : "তা ঠিক নয়। জীবনে ছবি তো বড় একটা দেখিনি! কিন্তু কী চমৎকার ওই ছবিতে মহিলার মুখখানা! এখানা কার ছবি ?"

বৃদ্ধা বললেন : "বলতে কি, আমিও ঠিক জানি না।"

অলিভার বললো : "চোখ দু'টো গভীর বিষাদে মাখা। এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছে মহিলা যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছেন! ছবিখানা যেন জীবন্ত—আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, অথচ পারছে না!"

অলিভারের কথার ধরনে বৃদ্ধা ভয় পেয়ে গেলেন, বুঝি বা অসুখের ঘোরে অলিভারের মাথার কোনো গোলমাল হয়ে থাকবে! তাই তিনি অলিভারকে তাড়াতাড়ি খানিকটা গরম সুরুয়া আর টোষ্ট খেতে দিলেন। খাওয়া শেষ হ'তে না হ'তেই ঘরে ঢুকলেন মিস্টার ব্রাউন্‌লো।

অলিভারকে এত রোগা হয়ে যেতে দেখে খুব মুষড়ে পড়লেন মিঃ ব্রাউন্‌লো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : "কেমন আছো টম্ হোয়াইট্ ?"

অলিভার বললো : "আমার নাম টম্ হোয়াইট্ নয় স্যার। আমার নাম অলিভার টুইষ্ট।"

মিঃ ব্রাউন্‌লো জিজ্ঞাসা করলেন : "তবে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে টম্ হোয়াইট্ বলেছিলে কেন ?"

অলিভার বললো : "এ-কথা তো আমি বলিনি স্যার!"

মিঃ ব্রাউন্‌লো একনজরে তাকিয়ে রইলেন অলিভারের মুখের দিকে। না, ও-মুখে মিথ্যার একটাও রেখা নেই। অলিভারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে একখানা অতি পরিচিত মুখ মিস্টার ব্রাউন্‌লোর মনে ভেসে উঠলো। তিনি একবার দেয়ালের সেই ছবির দিকে আর একবার অলিভারের মুখের দিকে আঙুল দেখিয়ে বৃদ্ধাকে বললেন : "এদিকে চেয়ে দেখ, বেডুইন—এ কি অদ্ভুত মিল! অলিভার যেন দেয়ালের ওই তৈলচিত্রের জীবন্ত মূর্তি!"

মিঃ ব্রাউন্‌লোর সেই উত্তেজিত গলা আর তাঁর বিস্ময়ভরা হাবভাব দেখে-শুনেই অলিভার কাঁপা গলায় কি যেন বলতে-বলতে বেহুঁশ হয়ে পড়লো।

* * *

সেদিনের ওই ঘটনার পর থেকে অলিভারের সামনে মিঃ ব্রাউন্‌লো ও মিসেস্ বেডুইন ওই তৈলচিত্রের কথা আর তুলতেন না।

বৃদ্ধার সেবাযত্নে অলিভার খুব তাড়াতাড়ি একেবারে সুস্থ হয়ে উঠলো। সে এখন বেশ চলাফেরা করতে লাগলো।

দিন সাতেক পরে মিসেস্ বেডুইনের সঙ্গে বসে অলিভার গল্প করছে, এমন সময়ে মিঃ ব্রাউন্‌লো তাকে লাইব্রেরী ঘরে ডেকে পাঠালেন।

মিঃ ব্রাউন্‌লোর লাইব্রেরী ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা মারলো অলিভার। তারপর তাঁর ডাকে ঘরের ভেতর ঢুকে সে দেখলো, চারিদিকে কাঁড়িকাঁড়ি বই, আর মিঃ ব্রাউন্‌লো জানালার ধারে ব'সে একখানা বই পড়ছেন।

অলিভারকে দেখে হাতের বইখানা বন্ধ ক'রে মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন: "নাও, এখন তোমার আগাগোড়া ইতিহাস বলো। কে তোমাকে মানুষ করেছে? কি ক'রে চোর-বদ্‌মাশের দলে তুমি ভিড়লে?"

পুরোনো জীবনের কথা মনে পড়ায় অলিভারের দু'চোখ জলে ভ'রে উঠলো। চোখের জল মুছতে মুছতে সবে সে তার কাহিনী শুরু করেছে, এমন সময় দরজায় সজোরে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। ভৃত্য ছুটতে-ছুটতে ওপরে এসে বললো: "হুজুর! মিস্টার গ্রীম্‌উইগ্ এসেছেন।"

—"তাহ'লে তো ভালোই হলো। যা, চা করে নিয়ে আয়। সে তো আর চা না খেয়ে এখান থেকে নড়বে না।" বললেন মিঃ ব্রাউন্‌লো।

অলিভার ঘর থেকে চলে যেতে চাইলো, কিন্তু মিঃ ব্রাউন্‌লো তাকে সেখানে থাকতে অনুরোধ করে বললেন: "অলিভার, যে আসছে সে আমার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার বাইরের আচরণ রুক্ষ হলেও অন্তর খুব মহৎ।"

এমন সময় লাঠিতে ভর দিয়ে একজন বুড়ো ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। তাঁর হাতে একটা কমলালেবুর খোসা।

ঘরে ঢুকেই তিনি গর্জন ক'রে উঠলেন: "এই দেখ! একবার কমলা-লেবুর খোসার জন্যে একখানা পা খোঁড়া হয়ে গেছে আমার। শেষ পর্যন্ত দেখছি, এই কমলালেবুর খোসার জন্যেই আমার প্রাণটাও যাবে। এ যদি না হয় তো আমি নিজেই নিজের মাথা খাবো।"

মিস্টার ব্রাউন্‌লো হেসে উত্তর দিলেন: "তোমার মাথাটা এমন বড়ো যে কারও পক্ষেই সেটা খেয়ে ওঠা সম্ভব নয়—তার ওপর তোমার মাথায় পাউডারের যা পুরু প্রলেপ!"

—"না, আমার মাথা আমি খাবোই", ব'লে মিস্টার গ্রীম্‌উইগ্ আরও কি একটা যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে অলিভারের দিকে নজর

পড়ল তাঁর। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, "ওহে, এ ছোকরাটা আবার কে ?"

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেনঃ "এই হলো অলিভার টুইষ্ট, যার কথা তোমায় এর আগে বলেছি।"

অলিভার মিস্টার গ্রীমউইগ্‌কে নমস্কার করলো।

মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌ বললেনঃ "এরই বুঝি জ্বর হয়েছিলো ? দাঁড়াও, এই ছোকরাটাই তাহ'লে কমলালেবু খেয়ে তার খোসাটা ফেলেছিলো ! এ যদি না ফেলে থাকে তো আমি আমার মাথা খাবো—ওর মাথাটাও খাবো।"

মিঃ ব্রাউন্‌লো হাসতে-হাসতে বললেনঃ "না-না, ও ফেলেনি। নাও, তুমি এখন বসো।"

বেশ খানিকক্ষণ গজ্‌ গজ্‌ ক'রে মিস্টার গ্রীম্‌উইগ্‌ কিছুটা শান্ত হলেন। তারপর অলিভারকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কেমন আছো অলিভার ?"

—"অনেকটা ভালো !" অলিভার জবাব দিলো।

মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌ আবার কিছু একটা বেয়াড়া টিপ্পনী করতে যাচ্ছেন দেখে মিঃ ব্রাউন্‌লো অলিভারকে পাঠিয়ে দিলেন মিসেস্‌ বেডুইনের কাছে চা হয়েছে কিনা খবর নিতে।

অলিভার চ'লে যেতেই মিঃ ব্রাউন্‌লো জিজ্ঞাসা করলেনঃ "ছেলেটা চমৎকার দেখতে—তাই না ?"

মুখ বেঁকিয়ে মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌ বললেনঃ "অতশত জানি নে, বাপু !"

মিঃ গ্রীম্‌উইগের চোখে অলিভারের চেহারা যে ভালো লাগেনি, তা নয়,—আসলে তাঁর স্বভাবই হলো, বন্ধু মিঃ ব্রাউন্‌লোর প্রত্যেক কথার বিরুদ্ধে কথা কওয়া।

খানিকক্ষণ পরে চা নিয়ে এলেন মিসেস্‌ বেডুইন্‌। সঙ্গে এলো অলিভার।

চা খেতে-খেতে মিঃ ব্রাউন্‌লোকে জিজ্ঞাসা করিলেন মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌ঃ "তা, এ ছোকরার আস্থি কাহিনীটা কি ?"

—"তা এখনো জানতে পারিনি। সেটা শোনার জন্যেই তো ওকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি।" এই বলে মিঃ ব্রাউন্‌লো অলিভারের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ "তুমি কাল সকাল দশটার সময় আমার কাছে আবার এসো, অলিভার।"

—"যে আজ্ঞে, স্যার।" এই বলে অলিভার চলে গেল তার নিজের ঘরে।

মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌ ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে মিঃ ব্রাউন্‌লোকে বললেন ঃ "আমি হলফ করে বলছি, ও আর তোমার কাছে কখনোই নিজের কেচ্ছাকাহিনী বলতে আসবে না। ও ছোকরাটা তোমাকে শুধু ধোঁকা দিচ্ছে।"

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন ঃ "আমিও হলফ করে বলতে পারি, ও ছেলেটা আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে না।"

—"যদি ধোঁকা না দেয় তো আমি···" কথাটা শেষ করতে পারলেন না, মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌। উত্তেজনায় তাঁর হাতের লাঠিটা মাটির ওপর ঠক্‌ করে প'ড়ে গেল।

—"আমি ওর সত্যবাদিতার তরফে আমার যথাসর্বস্ব, মায় জীবন পর্যন্ত বাজি রাখতে রাজী", বললেন মিঃ ব্রাউন্‌লো।

—"আর আমি ওর মিথ্যাবাদিতার তরফে বাজি রাখছি আমার মাথা", এই ব'লে মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌ টেবিলের ওপরে ঘুষি মারলেন।

মিঃ ব্রাউন্‌লো অতিকষ্টে রাগ দমন ক'রে বললেন ঃ "আচ্ছা, কাল সকালেই দেখা যাবে।"

মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌ বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন ঃ "বেশ, দেখো তুমি।"

ঠিক এই সময়ে এক-বাণ্ডিল বই হাতে নিয়ে মিসেস্‌ বেডুইন্‌ ঘরে ঢুকলেন। বইগুলো মিঃ ব্রাউন্‌লো সেই দোকানদারকে তাঁর বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার জন্যে ব'লে এসেছিলেন। মিসেস্‌ বেডুইন্‌ ঘর ছেড়ে চলে যাবার সময় মিঃ ব্রাউন্‌লো তাঁকে ডেকে বললেন ঃ "যে ছোকরা বই এনেছে, তাকে দাঁড়াতে বলো, বেডুইন্‌।"

—"সে তো চ'লে গেছে, স্যার।"

—"ডেকে আনো তাকে। বইগুলোর দাম দেওয়া হয়নি যে এখনো। তাছাড়া, কতকগুলো বই বেশি পাঠিয়েছে—সেগুলো ফেরত যাবে!"

মিসেস্‌ বেডুইন্‌ তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেলেন ছোকরাকে খুঁজতে, কিন্তু ছোকরাকে দেখতে না পেয়ে আবার ফিরে এলেন।

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন ঃ "ভারী খারাপ হলো—বইগুলো আজই ফেরত দেওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া, দোকানদার আমার কাছে সাড়ে চার পাউণ্ড পাবে। সেটা তাকে দেওয়া এখনি দরকার।"

বিদ্রূপের সুরে মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌ বললেন ঃ "তাহ'লে অলিভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও—সে যে ঠিক পৌঁছে দেবে, তা তো জানোই।"

বন্ধুর বিদ্রূপ সইতে পারলেন না মিঃ ব্রাউন্‌লো। অলিভারকে ডেকে পাঠানো হলো আবার। সে আসতেই মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন ঃ "তুমি

তো সেই বইয়ের দোকানদারকে চেনো। তাকে কি এই বইগুলো ফেরত দিয়ে আসতে পারবে অলিভার ?”

অলিভার বললোঃ “হ্যাঁ, ওগুলো আমাকে দিন, আমি এখনি ছুটে দিয়ে আসবো।”

মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌ ব্যঙ্গভরে কেশে উঠলেন। মিঃ ব্রাউন্‌লো আর সইতে না পেরে বললেনঃ “হ্যাঁ, অলিভার, তুমিই বইগুলো ফেরত দিয়ে এসো। দোকানদার আমার কাছে সাড়ে-চার পাউণ্ড পাবে—এই পাঁচ পাউণ্ডের নোটখানা নিয়ে যাও, দশ শিলিং ফেরত এনো।”

বই আর টাকা নিয়ে অলিভার বেরিয়ে গেল। পথ বাতলাতে বাতলাতে মিসেস্ বেডুইন্ তার সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত গেলেন। অলিভারের চলমান মূর্তির দিকে তাকিয়ে তিনি নিজের মনেই বললেনঃ “ওকে চোখের আড়াল করতে আমার মন চায় না !”

এদিকে মিঃ ব্রাউন্‌লো টেবিলের ওপর তাঁর ঘড়ি রেখে বললেনঃ “কুড়ি মিনিটের মধ্যেই অলিভার ফিরে আসবে।”

মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌ বললেনঃ “তুমি কি সত্যিসত্যিই আশা করো, ও ছোকরাটা আবার ফিরে আসবে ? এক-সেট নতুন জামা-কাপড় পেয়েছে, একবাণ্ডিল দামী বই আর পাঁচ পাউণ্ড হাতিয়েছে, এখন ও সিধে গিয়ে ওর পুরোনো বন্ধুদের দলে মিশে তোমাকে উপহাস করবে। ও-ছোকরা যদি কখনো এ-বাড়ীতে ফিরে আসে তো আমি আমার মাথা খাবো।”

তারপরই দু'বন্ধুতে টেবিলের ঘড়ির দিকে চেয়ে নীরবে মুখোমুখি ব'সে রইলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। তবুও দু'বন্ধুতে তেমনি ঠায় বসে। তাঁদের নজর ঘড়ির কাঁটার দিকে। কোথায় অলিভার ?

ভর সন্ধ্যে বেলায় আলো জেলে সদর দরজা খুলে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মিসেস্ বেডুইন্। ভৃত্যেরা বিশবার ছুটে গেছে রাস্তায়। অলিভারের খোঁজে, কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পায়নি। বইয়ের দোকানদারও হলফ করে বলেছে যে অলিভার একবারও তার দোকানে আসেনি—বই ফেরত দেওয়া তো দূরের কথা।

এদিকে দুই বুড়ো সমানে বসে অলিভারের জন্যে অপেক্ষা করছেন ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অলিভারকে জনতার হাতে ছেড়ে দিয়ে চার্লি ও ধুরন্ধর ফিরে এলো ফ্যাগিনের আস্তানায়।

—"অলিভার কোথায়?" চোখ লাল করে প্রশ্ন করলো ফ্যাগিন্।

ফ্যাগিনের চেলা খুদে-চোরেরা ওস্তাদের রাগ দেখে ভয় পেলো। কোনো জবাব দিলো না তারা।

ধুরন্ধরের জামার কলার চেপে ধরে ফ্যাগিন্ বললোঃ "কি করেছিস্ তোরা ও ছোকরার? এখনি বল্, নইলে তোকে গলা টিপে মেরে ফেলবো।"

সে যা বলছে, তা যে সে সত্যিই করবে, এমনি একটা ভাব ফ্যাগিনের চোখে-মুখে ফুটে উঠতে দেখে ভয়ে শিউরে আর্তনাদ করে উঠলো চার্লি বেট্স।

—"বল্ শীগগির!" আবার গর্জন করে উঠলো ফ্যাগিন্। মুখ গোমড়া করে ধুরন্ধর বললোঃ "পুলিসের ফাঁদে সে ধরা পড়েছে। ছাড়ো— আমাকে ছেড়ে দাও।" এই বলে সে এক ঝটকায় তার ঢিলে জামাটার ভেতর দিয়ে গ'লে বেরিয়ে গেল। জামাটা ফ্যাগিনের হাতেই রয়ে গেল! তারপর সে একটা খুন্তি তুলে ছুঁড়ে মারলো ফ্যাগিনের দিকে।

চকিতে স'রে দাঁড়ালো ফ্যাগিন্। সঙ্গে-সঙ্গে একটা লম্বা ডিগবাজী খেয়ে মদের বোতল তুলে নিয়ে ধুরন্ধরের দিকে তাক্ করলো, কিন্তু সেই সময়ে চার্লির গলা-ফাটানো চিৎকারে বিরক্ত হয়ে তার দিকেই ছুঁড়ে মারলো সেটা।

বোতলটা লুফে নিয়ে কে যেন মোটা-গলায় ব'লে উঠলোঃ "কে ছুঁড়লো রে এটা? এতে নেহাতই মদ আছে তাই, নইলে একজনকে আজ খুন করতুম নিশ্চয়ই।" বলতে-বলতে ঘরে ঢুকলো বছর-পঁয়ত্রিশের গুণ্ডার মতো চেহারার একটা লোক। তার পেছনে-পেছনে এলো সাদা রঙের একটা লোমশ কুকুর।

ঘরে ঢুকেই ফ্যাগিন্‌কে বললো সেঃ "আরে বেহায়া অর্থপিশাচ! ছেলেগুলোর ওপর আবার জুলুম করছিস্? এরা যে কেন তোকে এখনও খুন করেনি, তা ভেবে আমি অবাক্ হই।"

আগন্তুক বিল সাইক্‌স্‌কে দেখে ফ্যাগিনের গরম মেজাজ উবে গেল একেবারে। সাইক্‌স্‌কে দু-তিন গেলাস মদ খাইয়ে তখনই শান্ত করলো ফ্যাগিন্। সাইক্‌স্ এবার ধুরন্ধরের কাছ থেকে অলিভারের ব্যাপারটা সব জেনে নিলো।

ফ্যাগিন্ বললো ঃ "আমার ভয় হয়, সে হয়তো এখানকার কথা পুলিসের কাছে ফাঁস ক'রে দিয়ে বিপদে ফেলবে আমাদের !"

সাইক্‌স্ পরামর্শ দিলো ঃ "পুলিস-অফিসে কি ঘটেছে, কেউ গিয়ে সে খবরটা জেনে আসুক এখনি !"

কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় পুলিসের আওতায় যেতে কেউই রাজী নয়। এমন সময়ে ঘরে ঢুকলো দুটো মেয়ে—ন্যান্‌সি আর বেট্। শেষে ফ্যাগিনের অনুরোধে ন্যান্‌সি অলিভারের খবর নিয়ে আসতে রাজী হলো।

এক-হাতে একটা ঝুড়ি আর অপর হাতে একটা বড়ো চাবি নিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে পথে বেরিয়ে ন্যান্‌সি ইনিয়ে-বিনিয়ে চেঁচাতে লাগলো ঃ "ওগো, তার কি হলো গো ? তাকে কোথায় কে ধ'রে নিয়ে গেলো গো ? দয়া ক'রে বলুন হুজুরেরা, আমার ভাইটা কোথায় আছে গো !"

এভাবে চেঁচাতে-চেঁচাতে ন্যান্‌সি কোর্টে গিয়ে দারোগাবাবুর কাছে আছড়ে পড়লো। দারোগাবাবু বললেন যে, অলিভারকে যে-ভদ্রলোক নিয়ে গেছেন, তিনি তাঁর সঠিক ঠিকানা জানেন না, তবে তিনি বোধহয় পেণ্টন্‌ভিলে থাকেন, কেননা সেদিকেই তিনি গাড়ী হাঁকাতে হুকুম দিয়েছিলেন কোচোয়ান্‌কে।

ন্যান্‌সি ফিরে এসে ফ্যাগিন্‌কে সেই খবরটা জানালো। ফ্যাগিন্ অলিভারের খোঁজ করার জন্যে কড়া-হুকুম দিলো সাগরেদদের। যেমন ক'রে হোক্, জীবন্ত বা মৃত, অলিভারকে নিয়ে আসা চাই-ই !

পুলিসের কাছে কতটা কি ফাঁস করে দিয়েছে অলিভার তার আস্তানার বিষয়ে, তা জানা না পর্যন্ত ফ্যাগিন্ বা তার দলের কেউই নিশ্চিন্ত হতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত পুলিসের ভয়ে পুরোনো আস্তানা ছেড়ে ফ্যাগিন্ কিছুদিনের মতো গা ঢাকা দিলো অন্য জায়গায়। সঙ্গে নিয়ে গেল তার লুকোনো বাক্সটা, যার মধ্যে দামী দামী চোরাই মাল রেখে দিয়েছে সে সাগরেদদের নজর এড়িয়ে।

* * *

বেশ কয়েকদিন পরের কথা।

লিট্‌ল্ স্যাফ্রন্-হিলের সবচেয়ে নোংরা-অঞ্চলের একটা শুঁড়ীখানার বাইরের ঘরে বসে ছিলো বিল্ সাইক্‌স্। চিন্তায় ডুবে আছে সে। তার পায়ের কাছে ব'সে একটা সাদা-লোমওলা কুকুর জিভ দিয়ে নিজের মুখের ঘা চাটছিলো, আর মাঝে-মাঝে মনিবের দিকে লাল চোখে তাকিয়ে তার মনের ভাবটা বোঝার চেষ্টা করছিলো।

হঠাৎ সাইক্‌স্ কুকুরটাকে ধমক দিয়ে গর্জে উঠলো : "চুপ রও, হারামজাদা! চুপ!" কুকুরটার পিট্‌পিটে চাউনির ফলে হয়তো তার গভীর চিন্তায় বাধা পড়ছিলো।

বারবার সাইক্‌সের লাথি খেয়ে কুকুরটা এধার-ওধার ছুটোছুটি করতে-করতে একসময় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এমন সময় ঘরে ঢুকলো ফ্যাগিন্।

তাকে দেখে সাইক্‌স্ রেগে ব'লে উঠলো : "আরে বেটা হা-ভাতে চোর! তুই আবার আমার কুকুরের ব্যাপারে নাক গলাতে এলি কেন?"

মুখ কাঁচুমাচু করে ফ্যাগিন্ বললো : "বিল্, তোমার হয়েছে কি বলো তো? মেয়েটাকে কি বাগে আনতে পারোনি এখনো?"

ফ্যাগিনের মুখে মেয়েটা অর্থাৎ ন্যান্‌সির নাম শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলো সাইক্‌স্। লাফিয়ে উঠে ফ্যাগিনের ঘাড় ধরে বললো : "ফের ওর নাম মুখে এনেছিস্ তো খুন-খারাপী হয়ে যাবে শয়তান!"

ফ্যাগিন্ ভেবে পায় না সাইক্‌সের মনের কথা। তার দলের মধ্যে সাইক্‌স্ হচ্ছে সবচেয়ে সেরা চৌখোশ মাথা, কিন্তু বড়োই একরোখা সে। যা বলবে, তা সে করবেই, আর যেটা না করতে চাইবে, সেটা তাকে দিয়ে কিছুতেই করানো যাবে না। এ হেন দুর্দান্ত লোককে দিয়ে কতো কি বেপরোয়া চুরি ডাকাতির কাজ করিয়েছে ফ্যাগিন্ তার ঠিক-ঠিকানা নেই। মানুষ খুন করা তো অতি মামুলী ধরনের কাজ বলে সে মনে করে। তাই কথায় কথায় ছুরি-পিস্তল চালাতে সে ওস্তাদ। দলের সেরা মেয়ে ন্যান্‌সিকে সাইক্‌সের হাতেই তুলে দিয়েছে ফ্যাগিন্ কাজের পুরস্কার হিসেবে। ফ্যাগিন্ ভেবেছিলো এতে সাইক্‌সের মেজাজ খুশী হবে। কিন্তু সাইক্‌স্ বদলালো না একটুও।

সাইক্‌সের শাসানি শুনে ফ্যাগিন্ সরে পড়বার তাল করছে, এমন সময় বাইরে হৈ-হট্টগোল শোনা গেল। সাইক্‌স্ বললো : "বলি, ব্যাপার কি ফ্যাগিন্! বাইরে চেঁচামেচিটা কিসের?"

ফ্যাগিন্‌ও বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। এমন সময়ে বার্নি নামে এক ছোকরা ইহুদী ঘরে ঢুকলো। ফ্যাগিন্ তাকে জিজ্ঞসা করলো : "এখানে আর-কেউ আছে নাকি?"

বার্নি নাকি-সুরে বললো : "কৈঁ, নাঁ-তোঁ!"

সাইক্‌স্ বললে : "বাইরে এতো গোলমাল কিসের? যা তো এখনি দেখে আয় ব্যাপারটা কি?"

* * *

ঠিক এই সময়ে ওপথ দিয়ে অলিভার যাচ্ছিলো মিঃ ব্রাউন্‌লোর বই-গুলো দোকানদারকে ফেরত দিতে। সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে, সে ফ্যাগিনের আস্তানার এত কাছ দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা মেয়ে—'ভাইটা আমার' ব'লে গলা-ফাটানো কান্নার সুরে চেঁচাতে চেঁচাতে এসে, সোহাগ ক'রে অলিভারের গলা জড়িয়ে ধরলো!

চম্‌কে উঠে অলিভার বললোঃ "এই, ছাড়ো, ছাড়ো—আমাকে ছেড়ে দাও।"

কিন্তু কে কার কথা শোনে? মেয়েটার এক হাতে একটা ঝুড়ি, আর অপর হাতে একটা বড়ো চাবি। সে আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলোঃ "আমার ভাই। ওরে আমার ভাই রে! ভগবান তোকে মিলিয়ে দিয়েছে রে, অলিভার! কত যে ভুগেছি তোর জন্যে! কত যে খুঁজেছি তোকে! চল্ চল্ ভাই—বাড়ি চল্।"

চেঁচামেচি শুনে রাস্তায় লোক জড়ো হয়ে গেল! সবাই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলোঃ "কি ব্যাপার?"

মেয়েটা কাঁদতে-কাঁদতে বললোঃ "এ হচ্ছে আমার ভাই অলিভার—মাসখানেক আগে ও বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে চোর-বদ্‌মাশের দলে মিশেছে। অনেক কষ্টে ওকে খুঁজে পেয়েছি।"

এই বলে আবার অলিভারের হাত ধরে টানাটানি করে মেয়েটা বললোঃ "ওরে অলিভার, এখন বাড়ি চল্! মা যে তোর জন্যে ছট্‌ফট্ করে মরতে বসেছে!"

মেয়েটার কান্না দেখে আর কথা শুনে রাস্তার লোকেরা অলিভারের ওপরই চটে গেল। একজন এগিয়ে এসে বললোঃ "এই জানোয়ার, বাড়ি ফিরে যা।" কেউ-বা বললোঃ "হতভাগা!"

অলিভার তাদের বললোঃ "আমি একে চিনি না। আমার কোনো বোন্ বা বাপ-মা নেই। আমি পেণ্টন্‌ভিলে থাকি।"

মেয়েটা কান্না-ভরা গলায় বললোঃ "শুনুন মশাইরা, কেমন বেপরোয়া মিথ্যে কথা বলছে শুনুন।"

এতক্ষণ পরে অলিভার মেয়েটার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে চম্‌কে উঠে বললোঃ "আরে, এ যে—ন্যান্‌সি!"

ন্যান্‌সি সঙ্গে-সঙ্গে ব'লে উঠলোঃ "দেখলেন তো আপনারা, এ আমাকে বেশ চেনে। এখন দয়া ক'রে আপনারা একে ধ'রে বাড়িতে দিয়ে যান, নইলে বাবা আর মা এর শোকে মারা যাবেন।"

এই সময়ে পাশের একটা শুঁড়ীখানা থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো বিল্ সাইক্স্ আর তার পেছনে সেই সাদা কুকুর। সে এসেই বললোঃ "এই অলিভার, শীগগির বাড়ি চল্ তোর মায়ের কাছে।"

অলিভার আপত্তি করতেই সাইক্স্ তার হাত থেকে বইয়ের বাণ্ডিলটা কেড়ে নিয়ে, তাই দিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড এক ঘা বসিয়ে দিলো। দুর্বল অলিভার সেই মার খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়লো। আর সেই মুহূর্তে ন্যান্সি ও সাইক্স্ তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল এক নোংরা গলিতে ভাঙাচোরা একখানা বাড়ির মধ্যে। ঢুকেই সদর দরজায় খিল্ এঁটে দিলো ন্যান্সি ও সাইক্স্। কুয়াশায় ঢাকা আঁধার রাত তখন নেমে এসেছে শহরের বুকে।

অলিভারকে দেখে ধুরন্ধর মুখ ভেঙচে ব্যঙ্গ করে বললোঃ "আরে-আরে, এই যে—এই যে বাছাধন! ও ফ্যাগিন্। এ-দিকে চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ!"

চার্লি বেটস্ হো-হো করে হাসতে-হাসতে বললোঃ "ওরে, তোরা আমায় ধর্ ধর্, আমি একটু হাসি!"

ধুরন্ধর অলিভারের পকেটগুলো হাতড়াতে লাগলো। চার্লি তার সামনে একটা বাতি ধ'রে বললোঃ "দেখ, দেখ, কি দামী পোশাক পরেছে! সঙ্গে আবার বই! একেবারে বাবু ব'নে গেছে দেখছি!"

ফ্যাগিন্ কপট বিনয়ের সঙ্গে অলিভারকে বারকয়েক সেলাম করে বললোঃ "তোমার উন্নতি দেখে ভারী খুশী হয়েছি, বাবাজী! তোমার এ পোশাকী জামা-কাপড় যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্যে ধুরন্ধর তোমাকে আরেক সেট জামা-কাপড় দেবে'খন। তা, তুমি চিঠি লিখে আগে আমায় জানালে না কেন যে, তুমি আজ ফিরে আস্‌ছো? তাহ'লে তো তোমার খাবারটা গরম ক'রে রাখা যেতো।"

এই সময়ে ধুরন্ধর অলিভারের পকেট থেকে পাঁচ পাউণ্ডের নোটখানা বের করতেই ফ্যাগিন্ সেখানা ছিনিয়ে নিলো। তাই দেখে সাইক্স্ এগিয়ে এসে বললোঃ "এ টাকা আমার, ফ্যাগিন্।"

ফ্যাগিন্ বললোঃ "না—না, বিল, এ টাকা আমার……বইগুলো তুমি বরং নাও।"

কিন্তু সাইক্স্ তাতে রাজী হলো না। সে স্পষ্টই বললোঃ "টাকা আমাকে না দিলে অলিভারকে ফেরত নিয়ে যাবো।" কথা বলতে-বলতে ফ্যাগিনের হাত থেকে নোটখানা সে ছোঁ মেরে কেড়ে নিলো।

অলিভার মিনতি ক'রে বললোঃ "ও টাকা আর ও বইগুলো আমার

নয়, ওগুলো সব আমার আশ্রয়দাতার। আমি যখন জ্বরে মরতে বসেছিলাম, তখন তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আমাকে এখানে রাখতে চাও রাখো, কিন্তু দোহাই তোমাদের, ও-টাকা আর ও-বইগুলো তাঁকে পাঠিয়ে দাও নইলে তিনি আমাকে চোর ভাববেন।"

এই ব'লে অলিভার উঠে দাঁড়িয়েই পাগলের মতো ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাগিন্ আর তার সাগরেদরা অলিভারকে ধরার জন্যে ছুটে পিছু ধাওয়া করলো।

এ অবস্থায় সাইক্‌স্ কি করবে তা ভেবে পেলো না। হঠাৎ কুকুরটার দিকে তার নজর পড়লো। কুকুরটা তখন বাইরে বেরুবার জন্যে ছটফট করছে। মনিবের হুকুম পেলেই ছুটে বেরিয়ে গিয়ে অলিভারের টুঁটি চেপে ধরবে, এমনি একটা ভাব তার।

কুকুরটার হাবভাব দেখে চকিতে সাইক্‌সের মাথায় মতলবটা এলো। সে তখনি কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়ে অলিভারের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে ঠিক করলো।

সাইক্‌সের ভাবগতিক বুঝতে পেরে ন্যান্‌সি ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ঃ "কুকুরটাকে আট্‌কে রাখো, বিল্, নইলে ছেলেটাকে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ফেলবে।"

সাইক্‌স্ বললো ঃ "সেটাই ওর উচিত সাজা হবে। স'রে যাও আমার পথ থেকে, নইলে দেয়ালে ঠুকে তোমার মাথা গুঁড়ো ক'রে দেবো।"

—"তা দেবে দাও, বিল্, কিন্তু আমাকে না মেরে ফেলে তুমি কুকুরটাকে ছেড়ে দিতে পারবে না।"

সাইক্‌স্ ধাক্কা দিয়ে ন্যান্‌সিকে ঘরের মেঝেয় ফেলে দিলো!

এমন সময় অলিভারকে পাকড়াও ক'রে তার কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে-টানতে ফ্যাগিনের দল ফিরে এলো।

অলিভারকে ঘরে নিয়ে এসে ফ্যাগিন্ তার ঘাড়ে কয়েকটা রদ্দা দিয়ে পাছায় লাথি মেরে তাকে মেঝেতে ফেলে দিল। তারপর সে ঘরের কোণ থেকে একটা ভারী লাঠি নিয়ে তেড়ে গেলো অলিভারকে মারতে। ন্যান্‌সির কাছ থেকে বাধা পেলো ফ্যাগিন্।

ন্যান্‌সি স্পষ্টই বললো ফ্যাগিন্‌কে ঃ "আমি অলিভারকে ধরে তোমাদের কাছে এনে দিয়েছি, কিন্তু তা বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে তার ওপর তোমাদের জুলুম দেখতে পারবো না বলে রাখছি!"

ফ্যাগিন্ বলে উঠলো : "বাঃ বাঃ ন্যান্‌সি! বেশ অভিনয় তুমি করতে পারো!"

ন্যান্‌সি বললো : "তোমার যা ইচ্ছা তা করতে পারো! মনে রেখো, বাচ্চা ছেলেটার ওপর বেশী জুলুম করলে তোমার শেষ পর্যন্ত ভালো হবে না কিন্তু!"

সাইক্‌স্ এতক্ষণ চুপচাপ ছিলো, কিন্তু ন্যান্‌সির কথার ধরন দেখে চোখ রাঙিয়ে বললো : "এসব কথার মানে কি ন্যান্‌সি?"

ন্যান্‌সি জবাব দেয় ঝাঁঝালো গলায় : "ছেলেটাকে নিয়ে যা-ইচ্ছে তাই সকলে মিলে করবে তা সইবো না আমি কিছুতেই। ওর ওপর মারধোর করতে দেবো না আমি।"

একথা শুনেই সাইক্‌সের মাথা গরম হয়ে উঠলো। সে চেঁচিয়ে বললো : "চুপ কর, ন্যান্‌সি, নইলে তোর মুখ ভোঁতা করে দেবো।"

সাইক্‌সের শাসানিতে ন্যান্‌সি ভয় পেলো না একটুও। সে চেঁচিয়ে বলতে শুরু করলো : "ওঃ! মুরোদ তো তোমার কতো তা জানতে আর বাকী নেই আমার! অপদার্থ কুত্তা কোথাকার!"

সাইক্‌সের রাগ চড়ে উঠলো সপ্তমে। ঘুষি বাগিয়ে ন্যান্‌সির দিকে তেড়ে গিয়ে সে বললো : "মুখ সামলে কথা ক' ন্যান্‌সি, নইলে আজ তোর শেষ দিন জেনে রাখিস্!"

ন্যান্‌সি নিজের মাথাটা এগিয়ে দিয়ে চেঁচাতে লাগলো : "মারো আমাকে, খুন করো আমাকে। তোরা সব দাঁড়িয়ে দেখ্ শয়তানের দল।"

সাইক্‌স্ ভেবে পেলো না সে কি করবে এবার বিদ্রোহী ন্যান্‌সিকে নিয়ে।

ফ্যাগিন্ এসে ওদের ঝগড়া থামিয়ে দেবার চেষ্টা করলো। সে বার-বার বললো : "ভদ্রভাবে কথা কও তোমরা—ভদ্রভাবে কথা কও!"

ন্যান্‌সি এবার আরো রেগে গেল। সে ফ্যাগিনের দিকে তেড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো : "ভদ্রভাবে! শয়তান কোথাকার! ভদ্র কথা শেখাচ্ছো এখন আমাকে? বাচ্চা বয়সে আমাকে চুরি করে এই জঘন্য আঁস্তাকুড়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলি কেন? উঃ মরণ না হওয়া পর্যন্ত এখানে আমাকে থাকতে হবে তোমার মতো শয়তানের জন্যে!"

বাধা দিয়ে ফ্যাগিন্‌ও চেঁচিয়ে ন্যান্‌সিকে বললো : "আর যদি এ ধরনের কথা বলো তো আরও জঘন্য ক্ষতি করবো তোমার।"

ন্যান্‌সি এবার রাগে নিজের চুল ছিঁড়তে-ছিঁড়তে ফ্যাগিনের দিকে

তেড়ে গিয়ে দুচার ঘা বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সাইক্স্ তার কবজি ধরে এমন একটা মোচড় দিলো যে ন্যান্সি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল।

এভাবে সেদিনের ঝগড়াটা মিটে গেল।

অলিভারের জীবনে নেমে এলো আবার অন্ধকার।

* * *

পরদিন দুপুর-নাগাদ অন্য সবাই বেরিয়ে গেলে, ফ্যাগিন্ অলিভারকে ভালো কথায় বোঝাতে লাগলো যে বেইমানির মতো পাপ আর নেই, তাই অলিভার যদি আবার আগের মতো দলের কাজ-কর্ম ঠিক মতো করে, তাহলে ফ্যাগিন্ আর তার সাকরেদরা সবাই তাকে বন্ধুর মতো ভালোবাসবে! আর যদি অলিভার এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করে কিংবা গোলমাল শুরু করে, তাহলে সে তাকে কেটে টুকরো টুকরো ক'রে পাতকোর ভেতর ফেলে দেবে। এ-রকম অনেক ছেলেকেই সে এর আগে খুন করেছে, এ-কথা যেন অলিভার মনে রাখে। এভাবে অলিভারকে শাসিয়ে ঘরে তালাচাবি দিয়ে ফ্যাগিন্ বেরিয়ে গেল।

প্রথম হপ্তাটা অলিভারকে একটা ঘরে আটকে রেখে তালা বন্ধ করে দেওয়া হলো। তারপর একদিন আর সে-ঘরে তালা দেওয়া হলো না। অলিভার তার ইচ্ছেমতো বাড়ির ভেতর ঘুরে ফিরে বেড়াবার অধিকার ফিরে পেলো। ঘরের বাইরে বেরিয়ে চারদিকে ঘুরে সে দেখলো, বাড়িখানা অত্যন্ত পুরোনো, এবং জানলা-দরজা সব-সময়েই বন্ধ থাকে।

এই বাড়িতেই অলিভার দেখতে পেলো, সদ্য জেল-ফেরত আঠারো বছরের ছোকরা চিট্লিংকে। চিট্লিং আসার পর থেকেই সে অলিভারকে দিন-রাত বেপরোয়া চুরি-ডাকাতির গল্প শোনাতে লাগলো।

* * *

কয়েকদিন পরে ফ্যাগিন্ বিল্ সাইক্সের আস্তানায় গিয়ে হাজির হলো একটা বিশেষ জরুরী কাজে। অলিভারের ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হওয়ার ফলে ন্যান্সি আগের মতো আর তাকে খাতির-যত্ন করলো না। অন্য সময় হলে ন্যান্সির এ বেয়াদবীর জন্যে ফ্যাগিন্ তাকে বিলক্ষণ ধমকাতো, কিন্তু আজ তার মনের অবস্থা অন্যরকম। যে করেই হোক্, এক বস্তা মোহরের জন্যে তাকে কাজটা হাতে নিতেই হবে, আর সে কাজটা ভালো-ভাবে করতে গেলে যে ন্যান্সির সাহায্য দরকার সে-বিষয়ে ফ্যাগিনের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ফ্যাগিন্ বললোঃ "টবি বলছিলো একটা ছোটো ছেলে পেলে নাকি কাজটা সারতে পারো তুমি? কথাটা কি সত্যি?"

সাইক্স্ জবাব দিলোঃ "কাজটা হাতে নেওয়া ঠিক হবে না। টবি আর আমি দুজনেই কাল বাড়িটাকে মোটামুটি দেখে এসেছি। সদর দরজা বেশ মজবুত, আর দেওয়াল খুব পাকা, তাই কোনো দিক্ দিয়েই সুবিধে করা যাবে না।"

ফ্যাগিন্ বললোঃ "কাজটা কিন্তু তোমাকে করতেই হবে বিল! এতে মোটামুটি লাভ হবার আশা আছে।"

সাইক্স্ বললোঃ "চেষ্টার ত্রুটি তো হয়নি। টবিকে নিয়ে যতটা সম্ভব খোঁজখবর নিয়েছি কাজটা করার জন্যে। বাড়ির চাকরবাকররা কুড়ি বছর ধরে ও-বাড়িতে কাজ করছে—তাদের কাউকে দলে ভেড়ানো যাবে না লোভ দেখিয়ে। শুধু একটা উপায় ঠাওরেছি। সেটা করতে হলে একটা ছোটো ছেলের দরকার হবে।"

ফ্যাগিন্ বললোঃ "আজকাল ছোটো ছেলের বড়োই অভাব। যে কটাকে আমার দলে ভিড়িয়েছিলাম, সবাই তো পুলিসের খপ্পরে পড়ে তাদের পেশা পালটেছে—তারা নাকি এখন লেখাপড়া শিখছে সরকারের অতিথিশালায়।"

সাইক্স্ বললোঃ "তাহলে উপায়?"

দুজনকেই বেশ চিন্তিত দেখা গেল।

ন্যান্সি এতক্ষণ কান খাড়া করে দুজনের কথা শুনছিলো। সে হঠাৎ এগিয়ে এসে ফ্যাগিন্‌কে বললোঃ "অলিভারের কথাটা বলেই ফেলো ফ্যাগিন্। আমাকে সমীহ করার দরকার নেই।"

একথা শুনে ফ্যাগিন্ হেসে ফেলে বললোঃ "দেখলে হে বিল্ আমাদের সমস্যাটা কতো সহজে সমাধান করে দিলো ন্যান্সি। একেই বলে—'স্ত্রিয়াশ্চরিতম্'। তাহলে কালই অলিভারকে পাঠিয়ে দেবো তোমার এখানে।"

সাইক্স্ খানিকটা ভেবে বললোঃ "সবচেয়ে ভালো হয় যদি ন্যান্সি তোমার ওখানে গিয়ে অলিভারকে নিয়ে আসে। তাহলে হয়তো ছেলেটাকে বাগে আনতে সুবিধে হবে।"

সাইক্‌সের একথা যুক্তিসংগত বলে মনে হলো ফ্যাগিনের। ঠিক হলো আগামীকাল রাতে ন্যান্সি ফ্যাগিনের আস্তানায় গিয়ে অলিভারকে নিয়ে আসবে।

বিদায় নিয়ে ফ্যাগিন্ চলে গেল ঘুরপথে আর একটা গোপন আস্তানায়, যেখান থেকে একবস্তা মোহরের বদলে একটা কাজের বরাত পেয়েছে সে।

* * *

পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে জেগে অলিভার সবিস্ময়ে দেখলো যে, তার পুরোনো জুতোজোড়া নেই, তার বদলে আছে পুরু সোল্‌ওয়ালা একজোড়া নতুন জুতো।

সেদিন অলিভারের সাথে সকালের জলখাবার খেতে ব'সে ফ্যাগিন্ বললো: "অলিভার, আজ রাতে তোমাকে সাইক্‌সের আস্তানায় যেতে হবে। ন্যান্‌সি তোমাকে নিতে আসবে।"

অলিভার প্রশ্ন করলো: "সেখানেই কি আমি বরাবর থাকবো?"

ফ্যাগিন্ জবাব দেয়: "আরে না-না। একটা কাজের জন্যে তোমাকে সাইক্‌সের দরকার। কাজটা হয়ে গেলে আমার এখানে আবার তুমি ফিরে আসবে।"

অলিভার শঙ্কিত হয়ে উঠলো, কিন্তু তার এতে করারই বা কি আছে। অলিভার নিজের মনকে তৈরী করে নিলো সারাদিন ধরে।

সন্ধ্যার পরে ফ্যাগিন্ বাইরে বেরুবার আগে অলিভারকে সতর্ক ক'রে দিয়ে বললো: "সাবধান অলিভার, খুব সাবধান! সাইক্‌সের রক্ত গরম হয়ে উঠলে খুন করা ছাড়া ও আর কিছুই ভাবতে পারে না। যাই বলুক-না কেন, মুখ বুজে ওর সব কথা শুনে যেও।"

ফ্যাগিন্ চলে যাবার পর অলিভার গালে হাত দিয়ে ভাবছে এমন সময়ে তাকে সাইক্‌সের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে ন্যান্‌সি এসে হাজির হলো। এ ক'দিনেই তার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। সে অলিভারকে আশ্বাস দিলো যে, যেমন ক'রেই হোক সে তাকে শয়তানদের হাত থেকে বাঁচাবে। সে আরও জানালো যে, অলিভারের হয়ে সে কথা বলেছিলো বলে তাকে খুব মার খেতে হয়েছে সেদিন। তারপর তার হাতে আর ঘাড়ে সে মারের চিহ্ন দেখালো।

সাইক্‌সের কাছে পৌঁছোনোর সঙ্গে-সঙ্গেই সাইক্‌স্ কোন কথা না বলে একটা রিভলবার বের করলো। অলিভারের সামনে সেটাকে ধরে সে শান্তকণ্ঠে বললো: "যদি কথা না শুনিস্ তো এক গুলিতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো!"

অলিভার ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

এর পরেই রাতের খাবার খেয়ে সাইক্‌স্ শুয়ে পড়লো। শোবার আগে

সে ন্যান্‌সিকে হুকুম করলো, ঠিক ভোর পাঁচটায় তাকে জাগিয়ে দিতে। অলিভার তার নির্দেশমতো ঘরের মেঝেয় শুয়ে অনেকক্ষণ জেগে রইলো। সে আশা করেছিলো, ন্যান্‌সি হয়তো সুযোগমতো তাকে কোনো উপদেশ দেবে। কিন্তু ন্যান্‌সি তখনও আগুনের কাছে ব'সে ব'সে অনেক কিছু ভাবছে। সাইক্‌স্‌কে ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেবার জন্যে সে বোধহয় সারা রাতই জেগে থাকবে!

ভোর পাঁচটার আগেই সাইক্‌স্ উঠে পড়লো। চোখ-মুখ তাড়াতাড়ি ধুয়ে অলিভারের সামনে একটা বড় আলখাল্লা এনে বললো ঃ "এটা গায়ের ওপর জড়িয়ে নে!" তারপর রিভলভারটা পকেটে পুরে অলিভারের হাত ধ'রে বেরিয়ে পড়লো সে। কোথায় যাচ্ছে, কি করতে হবে অলিভার কিছুই বুঝতে পারে না। ভয়ে কোনো কথাও বলতে পারে না সে। যেতে-যেতে পেছন ফিরে চায়, যদি ন্যান্‌সির সাথে চোখাচোখি হয়ে যায়। কিন্তু দেখলো, ন্যান্‌সি তখনও আগুনের দিকে এক নজরে চেয়ে একমনে যেন কি ভাবছে···আর কোনো দিকেই তার হুঁশ নেই।

সাইক্‌স্ অলিভারকে টানতে-টানতে বগলদাবা করে বেরিয়ে পড়লো।

* * *

বাদল-দিনের ঘোলাটে সকাল। গত রাতের বৃষ্টির জল জমে রয়েছে রাস্তায়। এখনও জোর বৃষ্টি হচ্ছে—সোঁ-সোঁ ক'রে বাতাস বইছে। আজ আবার হাটবার। ক্রমে ক্রমে রাস্তায় নানা ধরনের লোকের ভিড় বাড়ছে।

অলিভারকে কেবল গালাগাল আর তাড়া দিতে দিতে সাইক্‌স্ হাইড-পার্ক পেরিয়ে কেনসিংটনের পথ ধরলো। তারপর একখানা চলন্ত গাড়ির মালিককে রাজী করিয়ে অলিভারকে নিয়ে তাতে চেপে বসলো। কিছুক্ষণ পরে নামলো এসে 'গাড়িঘোড়া' নামে এক সরাইখানার সামনে। তারপর অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে পৌঁছোলো হ্যাম্প্‌টন শহরে। সেখান থেকে কিছু দূরে শহরের বাইরে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে আবার শহরে ফিরে এসে এক সরাইখানায় গিয়ে রাতের খাবারের আয়োজন করতে হুকুম করলো।

খাওয়া-দাওয়ার পরে সাইক্‌স্ হ্যালিফোর্ড-গামী এক শ্রমিকের গাড়িতে চেপে শেপারটাউনে এসে নামলো অলিভারকে নিয়ে। তারপর জলকাদা ভেঙে, অন্ধকার গলিঘুঁজি আর চষা-ক্ষেতের ওপর দিয়ে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে থামলো একখানা পোড়ো বাড়ির সামনে। অন্ধকার নির্জন বাড়ি। মনে হয় প্রাণের কোনো সাড়া নেই তার ভেতরে—আশেপাশেও আর

নোয়ার টুঁটি টিপে ধ'রে ঝাঁকাতে লাগলো সে...

কোনো বাড়ি নেই। অলিভারের হাত ধ'রে সাইক্স্ ভেজানো দরজা ঠেলে সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো।

বাড়িতে কিন্তু মানুষ ছিলো। এই বাড়িতে সাইক্স্‌কে সাদরে অভ্যর্থনা করলো টোবি ক্র্যাকিট্ আর বার্নি। সাইক্স্ তাদের কাছে অলিভারের পরিচয় দিলো।

কিছুক্ষণ পরে খেতে বসলো তারা। মদের গেলাস মুখের কাছে তুলে তিনজনে ব'লে উঠলো: "আজকের অভিযান সফল হোক।" বলেই তারা গেলাসের পর গেলাস ভ'রে মদ খেতে লাগলো। অলিভারের আপত্তি সত্ত্বেও তারা তাকে জোর ক'রে খানিকটা মদ খাইয়ে দিলো। খাওয়ার পরেই সবাই শুয়ে পড়লো।

মদের নেশায় অলিভারের সারা দেহ ভারী হ'য়ে এলো। সে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখছিলো, সে যেন তার ছেলেবেলার জীবনে ফিরে গেছে। হঠাৎ সে চম্‌কে উঠলো টোবির গলা শুনে। টোবি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে ঘোষণা করলো: "দেড়টা বাজে!"

মুহূর্তমধ্যে অপর দু'জনও উঠে দাঁড়ালো। সাইক্স্ আর টোবি দু'খানা শালে নিজেদের মুখ আর গলা ঢেকে নিলো, তারপর বার্নির কাছ থেকে কয়েকটা যন্ত্রপাতি নিয়ে পকেটে পুরলো। বার্নি তাদের দু'জনকে দু'টো পিস্তল দিলো আর একটা লম্বা আলখাল্লা পরিয়ে দিলো অলিভারকে।

তারপর অলিভারের হাত দু'টো ধ'রে সেই কুয়াশায় ঢাকা রাতে বেরিয়ে পড়লো তারা।

সাইক্স্ ফিস্‌ফিস্ ক'রে বললো: "আজ রাতে সারা শহর ঢুঁড়লেও আমরা কারও চোখে পড়বো না।"

রাত দুটো-নাগাদ তারা শহর পেরিয়ে, পাঁচিল-ঘেরা একটা বাড়ির সামনে এসে থামলো। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। বাড়ির ভেতরেও সব চুপচাপ। চোখের নিমেষে টোবি ক্র্যাকিট্ পাঁচিলের ওপরে উঠে পড়লো। তারপর অলিভারকে নিয়ে সাইক্স্‌ও উঠলো এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তারা পাঁচিলের অপরদিকে বাগানের মধ্যে নেমে পড়লো।

অলিভার ভয়ে মাটির ওপর বসে পড়লো। সাইক্স্ রেগে ব'লে উঠলো: "শীগ্‌গির ওঠ্, শুয়োর! নইলে তোর মাথা গুঁড়িয়ে এই ঘাসের সঙ্গে মিশিয়ে দেবো।"

অলিভার কাঁপতে-কাঁপতে বললো: "তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও।"

সাইক্‌স্ পিস্তল বের ক'রে অলিভারকে গুলি করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু টোবি সেটা ছিনিয়ে নিলো, আর অলিভারের মুখে হাত চাপা দিয়ে বাড়ির দিকে এগুতে-এগুতে বললোঃ 'আর একটা আওয়াজ করেছিস কি, একটা বাড়ি দিয়ে তোর মাথা একেবারে গুঁড়ো ক'রে দেবো। বিল্ তুমি গিয়ে জানলাটা খুলে ফেল, আমি এটাকে সামলাচ্ছি। এসব ছেলেকে ঠাণ্ডা করার কায়দা আমার দস্তুরমতো জানা আছে।"

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ম্যাজিকের মতো সাইক্‌স্ বাড়ির পেছন-দিকের একটা ছোটো জানলা খুলে ফেললো। সে-জানলা দিয়ে অলিভারের মতো ছোটো ছেলে সহজেই গ'লে যেতে পারে। তারপর অলিভারের হাতে একটা লণ্ঠন দিয়ে কানে কানে বলে দিলঃ "বাড়ির ভেতর ঢুকে তুই চুপিচুপি দরজার খিলটা খুলে দে।"

জানলা দিয়ে ঘরের ভেতর লাফিয়ে পড়েই অলিভারের ইচ্ছে হলো, সে চেঁচিয়ে বাড়ির লোকজনদের জাগিয়ে তুলবে। কিন্তু হঠাৎ কানে এলো, জানলার ওপার থেকে সাইক্‌স্ চাপা গলায় বলছেঃ "ফিরে আয় হারামজাদা! ফিরে আয় জানলায়!"

ভয়ে অলিভারের হাত থেকে লণ্ঠনটা খ'সে পড়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে সিঁড়ির মাথায় দু'টো মূর্তির আবির্ভাব হ'লো আর আলোর একটা ঝল্‌কানির সঙ্গে কিছু ধোঁয়া দেখা গেল। গুলির আঘাত সইতে না পেরে অলিভার মুখ থুবড়ে পড়ে গেল জানলার কাছে। সাইক্‌স্ তখন সেই লোক দু'টোকে তাক্ ক'রে রিভলভার ছুঁড়তেই লোক দু'টো ভয়ে পালিয়ে গেল। সাইক্‌স্ আর বিন্দুমাত্র দেরী না ক'রে বাইরে থেকে হাত বাড়িয়ে, জামার কলার ধরে অলিভারকে টেনে জানলার বাইরে নিয়ে এলো।

সঙ্গে-সঙ্গে অলিভারকে কাঁধে তুলে নিয়ে সাইক্‌স্ ছুটতে লাগলো। অলিভারের পায়ে একটা গুলি এসে লেগেছিলো, সেজন্য প্রচুর রক্ত ঝরতে লাগলো। অলিভারকে কাঁধে নিয়ে ছুটতে অসুবিধে হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সাইক্‌স্ আধা-বেহুঁশ অলিভারকে একটা নরদমার ভেতর ফেলে রেখে পালালো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অলিভার ফিরে এলো না দেখে মিঃ ব্রাউন্‌লো তার পরের দিনই খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন ছাপাবার ব্যবস্থা করলেন। বিজ্ঞাপনটা ছিলো এরকমঃ

পুরস্কার ঘোষণা

> গত বৃহস্পতিবার রাতে অলিভার টুইষ্ট নামে একটি ছেলে তার পেণ্টন্‌ভিলের বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে, অথবা কেউ তাকে চুরি করে ধরে নিয়ে গেছে। যিনি তার খোঁজ দেবেন অথবা তার পুরোনো ইতিহাস জানাবেন, তাঁকে পাঁচ গিনি পুরস্কার দেওয়া হবে।

যেদিন বিজ্ঞাপনটা খবরের কাগজে বেরুলো, সেদিনই সন্ধ্যায় অনাথ-আশ্রমের কাজে মিস্টার বাম্ব্‌ল্ এসে পৌঁছোলেন লণ্ডনে। সরাইখানায় ঢুকে এক গেলাস কড়া মদ সামনে রেখে হাতের খবরের কাগজখানা খুলে ধরলেন তিনি।

বিজ্ঞাপনটা নজরে পড়তেই সেটা তিন-তিনবার পড়লেন মিস্টার বাম্ব্‌ল্। তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি পেণ্টনভিলের পথ ধরলেন—মদের গেলাসটা যেমন ছিলো তেমনি অবস্থায় প'ড়ে রইলো টেবিলের ওপর।

মিঃ বাম্ব্‌লের মুখে অলিভারের নাম শোনা মাত্র মিসেস্ বেডুইন্ তাঁকে মিস্টার ব্রাউন্‌লোর কাছে নিয়ে গেলেন। মিস্টার গ্রীম্‌উইগ্‌ও সেখানে হাজির ছিলেন।

অলিভারের পুরোনো ইতিহাস বলতে গিয়ে সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে মিঃ বাম্ব্‌ল্ যেসব কুৎসা রটালেন, তা শুনে মিঃ ব্রাউন্‌লো ও মিঃ গ্রীম্‌উইগ্ দু'জনেই খুব হতাশ হলেন। তাঁরা জানলেন যে, অলিভার জাত-না-জানা কুড়িয়ে-পাওয়া একটা ছেলে,—বেইমানী আর নীচতাই তার স্বভাব।

মিঃ বাম্ব্‌ল্ বিদায় নেবার পর মিঃ ব্রাউন্‌লো কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রে বললেন ঃ "বেডুইন্! অলিভার সত্যি একটা জোচ্চোর।"

কিন্তু মিসেস্ বেডুইন্ কিছুতেই একথা মানতে চাইলেন না। এর জন্যে মিঃ গ্রীম্‌উইগ্ তাঁকে বেশ একচোট ঠাট্টা করলেন।

* * *

যে অনাথ-আশ্রমে অলিভারের জন্ম হয়েছিলো, সেখানকার ধাইমা মিসেস্ কর্নি একলা তাঁর ঘরে বসেছিলেন। বাইরে তখন তুমুল ঝড়-বৃষ্টি চলছে। ঘরের ভেতর দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে এক কাপ গরম চা নিয়ে তিনি আরাম ক'রে খেতে বসেছেন।

চা খেতে-খেতে মৃত স্বামীর কথা তাঁর মনে পড়লো। মনে পড়তেই টি-পট-টার দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে উঠলেন ঃ "অমনটা আর

আমি পাবো না!" কার উদ্দেশে যে তিনি এ-কথা বললেন—মৃত স্বামী, না সামনের টি-পট্, তা বোঝা গেল না। এমন সময়ে ঘরে ঢুকলেন মিস্টার বাম্ব্‌ল্।

কিছুক্ষণ তাঁরা দু'জনে অনাথদের সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। দেখা গেল, একটা ব্যাপারে দু'জনেই একমত—দু'জনেরই লক্ষ্য হলো, অনাথদের শোষণ ক'রে তাদের পাওনা টাকা হাতিয়ে নিজেদের তহবিল বাড়ানো। কিছুক্ষণ এসব আলোচনার পরেই মিঃ বাম্ব্‌ল্ বিদায় নিচ্ছিলেন, কিন্তু বাইরে ঝড়-জলের জন্যে মিসেস্ কর্নি তাঁকে খানিকটা অপেক্ষা ক'রে, চা খেয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ জানালেন।

অগত্যা মিঃ বাম্ব্‌ল্ আবার চেপে বসলেন চেয়ারে।

চা খেতে ব'সে এ-কথা সে-কথার পর মিস্টার বাম্ব্‌ল্ মিসেস্ কর্নিকে বিয়ে করার কথাটা পাড়লেন। এমন সময়ে একটা বুড়ী এসে মিসেস্ কর্নিকে জানালো যে, স্যালী-বুড়ী মারা যেতে বসেছে—সে মরার আগে মিসেস্ কর্নিকে বিশেষ জরুরী কোনো কথা বলে যেতে চায়।

একথা শুনেই মিস্টার বাম্ব্‌ল্‌কে ঘরে অপেক্ষা করতে ব'লে, মিসেস্ কর্নি কর্তব্যের দায়ে সেই বুড়ীর সাথে বেরিয়ে গিয়ে হাজির হলেন খুপরির মতো একখানা ছোটো ঘরে। সেখানে তখন একজন ছোকরা ছাত্র-ডাক্তার স্যালী-বুড়ীর কাছে বসে কি যেন ওষুধ তৈরি করছে, আর স্যালী-বুড়ী বেহুঁশ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। কাছে আরও একজন বুড়ী বসে হা-হুতাশ করছিলো।

ছাত্র-ডাক্তারটির কাছে মিসেস্ কর্নি জানতে পারলেন যে, আর ঘণ্টা-দু'য়েকের মধ্যেই স্যালী-বুড়ী মারা যাবে এবং মরার আগে তার হুঁশ ফিরে পাবার আশা খুবই কম।

ছাত্র-ডাক্তারটি চ'লে গেলে, মিসেস্ কর্নি মুখ বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: "স্যালী-বুড়ী মরবে কখন তার জন্যে আমি কতক্ষণ অপেক্ষা করবো?"

ঘরে যে আর দু'জন বুড়ী বসেছিলো, তাদের একজন ব'লে উঠলো: "আর বেশীক্ষণ নয়, ঠাকরুন! আমাদের মরণের জন্যে কাউকেই আর বেশী দিন অপেক্ষা করতে হবে না!"

মিসেস্ কর্নি ধমকে উঠলেন: "চুপ কর, বুড়ী।" তারপর প্রশ্ন ক'রে জানতে পারলেন যে, স্যালী-বুড়ী এর আগেও বহুবার এমনি বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে থাকতো। এ-কথা শুনে মিসেস্ কর্নি চ'লে যাবার জন্যে উঠছিলেন, এমন সময়ে স্যালী-বুড়ী হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে বসলো এবং মিসেস্

কর্নির একখানা হাত ধ'রে টেনে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে বললো : "আপনার সঙ্গে আমার কিছু গোপন-কথা আছে—ওদের বের ক'রে দিন ঘর থেকে··· তাড়াতাড়ি করুন···তাড়াতাড়ি !"

ইচ্ছে না থাকলেও দু'জন বুড়ী মিসেস্ কর্নির ধাক্কা খেতে-খেতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মুমূর্ষু স্যালী-বুড়ী তখন সাধ্যমতো গলা উঁচু করে বলতে লাগলো : "এবার মন দিয়ে শুনুন আমার কথা। এই ঘরে, ঠিক এই বিছানায়, কত বছর আগে মনে নেই, কুড়িয়ে-পাওয়া একটি মেয়েকে এনে শোয়ানো হয়। তারপর তার একটি ছেলে হলো। আমি তার একটা জিনিস চুরি করেছি"—বলতে-বলতে উত্তেজনায় স্যালী-বুড়ী ধপাস্ ক'রে শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষণ বাদে আর্তনাদ ক'রে আবার বিছানার ওপরে উঠে বসে সে বললো : "সেটা ছিল তার একমাত্র সম্পদ্। তার পরনে গরম পোশাক ছিলো না বটে—পেটেও অন্ন ছিলো না, কিন্তু সেটা সে সযত্নে রেখেছিলো তার বুকের মধ্যে। খুব দামী সোনার জিনিস সেটা।"

—"সোনা !" মিসেস্ কর্নি আগ্রহের সঙ্গে বললেন : "বলো—বলো ! তারপর সেটার কী হলো ?"

স্যালী-বুড়ী বললো : "সেটা সে আমার কাছে বিশ্বাস ক'রে গচ্ছিত রেখেছিলো, আর শেষে মরার সময়ে হাত-জোড় ক'রে বলেছিলো, ছেলেটা যদি বাঁচে তো তাকে এটা দিতে—তা'হলে সে অন্ততঃ নেহাৎ অনাথ হবে না। ছেলেটার নাম রাখা হয়েছিলো অলিভার। আর আমি যে-সোনা চুরি করেছিলাম—"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ—বলো, বলো"—বলতে-বলতে মিসেস্ কর্নি একেবারে স্যালী-বুড়ীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

স্যালী-বুড়ী শেষে আর-একবার উঠে বসে বিড়বিড় করে কি-যেন বললো, তারপর তার প্রাণহীন দেহটা বিছানার ওপরে ঢলে পড়লো। তার হাতদুটো তখনও মিসেস্ কর্নির স্কার্টের প্রান্তদেশ জড়িয়ে ধরে আছে।

* * *

মিসেস্ কর্নির ঘরে একা বসে মিস্টার বাম্ব্‌ল্ যখন বারবার ঘরের আসবাব আর তৈজসপত্র নেড়েচেড়ে দেখে মনে মনে সেগুলোর দাম ক'ষে হিসেব শেষ করছিলেন, সেসময় ঘরে ঢুকলেন মিসেস্ কর্নি।

কথায় কথায় মিঃ বাম্ব্‌ল্ জানতে পারলেন যে, মিসেস্ কর্নি তাঁর

চাকরির দৌলতে বিনামূল্যে কয়লা ও মোমবাতি পান, এবং তাঁকে বাড়িভাড়া দিতে হয় না। তখন মিঃ বাম্ব্‌ল্‌ আবার সেই বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলেন। একটুখানি ইতস্ততঃ করার পর মিসেস্‌ কর্নি বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই মিসেস্‌ কর্নির অনুরোধে সেই ঝড়-জল মাথায় ক'রে মিঃ বাম্ব্‌ল্‌ ছুটলেন মিঃ সোয়ার্‌বেরীর বাড়ির দিকে, মৃতা স্যালী-বুড়ীর জন্যে কফিনের ফরমাস দিতে।

সোয়ার্‌বেরী-দম্পতি তখন বাড়ি ছিলেন না। নোয়া ক্লেপোল্‌ সেই অবকাশে শার্লটির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করছিলো। এমন সময় মিস্টার বাম্ব্‌ল্‌ সেখানে হাজির হলেন। বিয়ের কথা শুনতে পেয়ে তিনি ক'ষে ধমকে নোয়াকে বললেন ঃ "অ্যাঁঃ! এখানেও বিয়ে! সাবধান! ফের বিয়ের কথা বললে তোর মুণ্ডপাত করবো। যাক, শোন্‌! তোর মনিব এলে বলিস, আশ্রমের এক বুড়ীর জন্যে কাল সকালেই সে যেন একটা কফিন পাঠিয়ে দেয়।...দেশটা গোল্লায় গেল একেবারে—খালি বিয়ে আর বিয়ে!"

কথাগুলো বলতে বলতে মিঃ বাম্ব্‌ল্‌ বেরিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

নবম পরিচ্ছেদ

ফ্যাগিন্‌ তার আড্ডায় অগ্নিকুণ্ডের সামনে মুখভার করে বসেছিলো, আর ধুরন্ধর, চার্লস্‌ বেট্‌স্‌ ও চিট্‌লিং ব'সে তাস খেলছিলো।

সহসা সদর-দরজায় শব্দ শুনে ধুরন্ধর আগন্তুককে দেখতে গেল। অন্য দু'জন ফ্যাগিনের নির্দেশে চুপ ক'রে ব'সে রইলো।

ধুরন্ধরের পেছনে-পেছনে ঘরে ঢুকলো টোবি ক্র্যাকিট—এক-মুখ দাড়ি, রুক্ষ কর্কশ বীভৎস তার চেহারা। ঢুকেই ফ্যাগিন্‌কে সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ "কেমন আছো, ফ্যাগিন?"

যে-শালখানায় তার মুখ আর গলা ঢাকা ছিলো, সেখানা ধুরন্ধরকে রাখতে দিয়ে সে জামা খুলে ফেললো। তারপর উনুনের গায়ে পা তুলে বসে বললো ঃ "অনেকদিন পেটে দানা পড়েনি। সময়ে জানতে পারবে সব—আগে কিছু খেতে দাও।"

ফ্যাগিনের নির্দেশে ধুরন্ধর ক্র্যাকিটকে খেতে দিলে। সে পরম

তৃপ্তির সঙ্গে ধীরে-ধীরে খেতে লাগলো। ফ্যাগিন্ মনে-মনে অধীর হয়ে উঠলেও মুখে কিন্তু কোনো কথা বললো না।

খাওয়া শেষ ক'রে টোবি অন্য-সবাইকে ঘর থেকে বের ক'রে দেবার জন্যে ফ্যাগিন্‌কে বললো। তারপর সবাই বেরিয়ে গেলে সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ "আগে বলো, ফ্যাগিন্, বিল্ কেমন আছে?"

—"কি!" ফ্যাগিন্ সভয়ে চেঁচিয়ে মাটিতে পা ঠুকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ "কোথায় তারা? সাইক্‌স্ আর ছেলেটা কোথায়?"

টোবি কাঁপা গলায় বললো ঃ "আমাদের অভিযান ব্যর্থ হয়েছে।"

ফ্যাগিন্ তার জামার পকেট থেকে একখানা খবরের কাগজ টেনে বের ক'রে বললো ঃ "তা তো জানি। তারপর হয়েছে কি, তাই বলো।"

টোবি জানালো যে, বাড়ির লোকের গুলিতে আহত অলিভারকে পিঠে নিয়ে সাইক্‌স্ ছুটতে থাকে···বাড়ির লোকজনও তাদের তাড়া ক'রে পিছু নেয় এবং শেষে ধরা পড়ার উপক্রম হতেই সাইক্‌স্ অলিভারকে পথের ধারে একটা খানার মধ্যে ফেলে রেখে পালাতে বাধ্য হয়,—ছেলেটা বেঁচে আছে কি মারা গেছে, তা টোবি জানে না।

একটা ভয়ার্ত চীৎকার ক'রে ফ্যাগিন্ দু'হাতে নিজের চুল টানতে-টানতে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ল।

* * *

রাস্তায় বেরিয়ে একখানা গাড়ি ভাড়া করলো ফ্যাগিন্। তারপর সাইক্‌সের আস্তানার সিকি মাইল তফাতে পৌঁছে, গাড়িখানা ছেড়ে দিলো সে।

খানিকটা পথ হেঁটে একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়লো সে। গলির চেহারা দেখে সহজেই বোঝা যায় সেখানে সমাজের অতি নীচু স্তরের লোকেরা বাস করে। গলির শেষ প্রান্তে এসে ফ্যাগিন্ একটা দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে কথা কইলো দোকানের সেল্‌স্‌ম্যানের সাথে। তার কাছ থেকে সে জানতে পারলো যে সাইক্‌স্ এখনো তার ঘরে ফিরে আসেনি।

সাইক্‌সের আস্তানার পাশ দিয়ে এগিয়ে ফ্যাগিন্ একটা শুঁড়িখানায় ঢুকে পড়লো চুপি চুপি। শুঁড়িখানার মালিকের সাথে ফিসফাস কথা কইলো অনেকক্ষণ নিজের পেশার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। তারপর চলে আসার সময় সে জিজ্ঞাসা করলো ঃ "সে কি আজ রাতে এখানে আসবে?"

"মঙ্ক্‌সের কথা বলছো কি?"—জানতে চাইলো শুঁড়িখানার মালিক।

"চুপ!"—ফ্যাগিন্ বলে উঠলো, তারপর ছোট্ট 'হু' বলে জবাবের আশায় তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

শুঁড়িখানার মালিক বেশ নীচু গলায় জবাব দিলোঃ "এতক্ষণ এখানে তার এসে যাওয়া উচিত ছিলো। এখনও এলো না কেন তা তো বুঝতে পারছি না। আর দশ মিনিট অপেক্ষা করলে হয়তো—"

বাধা দিয়ে ফ্যাগিন্ তেমনি চুপিচুপি বললোঃ "সে এলে তাকে বলো আমি তার খোঁজে এসেছিলুম। সে যেন আজ রাতে—না, না—কাল রাতে আমার সাথে অতি অবিশ্যি একবার দেখা করে, বুঝেচো?"

এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে হনহন করে শুঁড়িখানা থেকে বেরিয়ে পড়লো সে। এবার সাইক্‌সের ঘরে ঢুকে ফ্যাগিন্ দেখলো, অতি বিষণ্ণভাবে টেবিলের ওপর মাথা রেখে ব'সে আছে ন্যান্‌সি। কোনো খবরই সে পায়নি বিল্ সাইক্‌সের—সে-ই বরং সাইক্‌সের কথা ফ্যাগিনের কাছে জানতে চাইলো। ফ্যাগিন্ তাকে টৌবির মুখে শোনা বিবরণ জানালে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ফ্যাগিন্ বললোঃ "হতভাগা ছেলেটার কথা ভাবো ন্যান্‌সি,—তাকে কিনা ওরা ফেলে এসেছে একটা খানার মধ্যে!"

ন্যান্‌সি হঠাৎ মাথা তুলে বললোঃ "সে-ছেলেটা যেখানেই থাক্, আমাদের সঙ্গে থাকার চেয়ে ভালোই থাকবে। আমি ভাবছি শুধু বিলের কথা। তার যেন কোনো ক্ষতি না হয়!"

* * *

গভীর রাতে নিজের বাড়ির সামনে এসে ফ্যাগিন্ যখন চাবি দিয়ে দরজা খুলছে, এমন সময়ে কে যেন তার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে ডেকে উঠলোঃ "ফ্যাগিন্!"

ফ্যাগিন্ চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললোঃ "তুমি কখন এলে মঙ্ক্‌স্?"

—"তা ঘণ্টা দুই হলো বই কি! আমি তোমার জন্যে তখন থেকে অপেক্ষা করছি—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

—"তোমারই কাজে বন্ধু, তোমারই কাজে। সব বলছি।"

মঙ্ক্‌স্‌কে নিয়ে ফ্যাগিন্ বাড়ির ভেতরে ঢুকলো। তারপর একটা নিরালা-কোণে দাঁড়িয়ে দু'জনে ফিসফিস ক'রে আলাপ করতে লাগলো।

মঙ্ক্‌স্ বারকয়েক ঘাড় নেড়ে বেশ জোর গলাতেই বললোঃ "ফন্দিটা তোমাদের তেমন সুবিধে হয়নি। ওকে এখানে আটকে রেখে গাঁটকাটা করে তুললে না কেন?"

ফ্যাগিন্ জানালো : "তা করার সুবিধে ছিলো না মোটেই।"

মঙ্ক্স্ বেশ ঝাঁঝালো সুরে বলে উঠলো : 'তুমি ইচ্ছে করলে তা করতে পারতে। এর আগে তো কত ছেলেকে তুমি প্যাকা পকেটমার, সিঁধেল তৈরি করেছো, আর আজও তাদের কাছ থেকে কমিশন খাচ্ছো। তুমি তাকেও পকেটমার করে জেলে পাঠিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করতে পারতে—হয়তো সে সারাজীবনের মতো দেশ থেকে নির্বাসিত হতো একদিন।"

রাগে গজগজ করতে লাগলো মঙ্ক্স্, আর ফ্যাগিন্ তাকে শান্ত করার জন্যে নিজের সাফাই গাইতে লাগলো : "চেষ্টা তো করেছিলুম, কিন্তু ধরা পড়ে ছেলেটা সব গোলমাল করে দিলে, আর যে মেয়েটাকে দিয়ে তাকে আবার রাস্তা থেকে নিজেদের আস্তানায় ফিরিয়ে আনলুম, সে মেয়েটা তার দিকে নেকনজর দিতে শুরু করেছে। সেটাই হচ্ছে এখন সবচেয়ে বড় বাধা।"

"তাহলে মেয়েটাকে গলা টিপে মেরে ফেলো।" বলে উঠলো মঙ্ক্স্। ফ্যাগিন্ বললো : "তা করার সময় আসেনি এখনো। হয়তো একদিন আমি নিজেই তা করবো। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। ছেলেটা পাকা চোর হয়ে গেলে মেয়েটার সহানুভূতি হারাবে, আর ছেলেটা যদি আমাদের হাতেই মারা যায় তাহলে তো কোনো কথাই নেই!"

বাধা দিয়ে বলে ওঠে মঙ্ক্স্ : "না-না, মেরে ফেলো না তাকে। চুরি-ডাকাতি করতে গিয়ে যদি সে মারা যায়, তাহলে তো আমার বিরুদ্ধে কারুর বলার কোনো কিছুই নেই। মোদ্দা কথা, তাকে নিয়ে যা খুশী করতে পারো, কিন্তু নিজেরা মেরে ফেলো না। ওতে আমার ক্ষতি হতে পারে।"

কথা বলতে-বলতে মঙ্ক্স্ চমকে উঠে বললো : "ওকি! একটা ছায়া দেখলাম যেন!"

তখন দু'জনে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে চারদিকে খুঁজলো, কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলো না।

ফ্যাগিন্ বললো : "কিছুই দেখনি তুমি! ও তোমার চোখের ধাঁধা!"

কাঁপতে-কাঁপতে মঙ্ক্স্ বললো : "না-না, ধাঁধা নয়, আমি দিব্যি গেলে বলছি যে স্পষ্ট দেখলাম একটা মেয়েমানুষের ছায়া সরে গেল।"

ফ্যাগিন্ জোর দিয়েই বললো : "এ বাড়িতে কোনো মেয়েমানুষ থাকে না যে গভীর রাতে তার ছায়া দেখতে পাবে।"

রাগে গজগজ করতে-করতে চলে গেল মঙ্ক্স্।

দশম পরিচ্ছেদ

ভোরের কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস লেগে খানার মধ্যে অচেতন অলিভারের জ্ঞান ফিরে এলো। কোথায় আছে, কেনই বা সেখানে এসেছে, প্রথমে কিছুই মনে করতে পারলো না সে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই দারুণ যন্ত্রণায় 'মা-গো' বলে আবার সে জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার জ্ঞান ফিরে এলো তার। সে বুঝতে পারলো, এই খানার মধ্যে এভাবে প'ড়ে থাকলে তাকে এখানেই মরে প'ড়ে থাকতে হবে। তাই বহু চেষ্টা ক'রে কোনোমতে খানা থেকে উঠে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলো সে! তার মাথা ঘুরছে, পা কাঁপছে, তবু সে হেঁটে চললো।

কিছুক্ষণ চলার পরে সামনেই দেখলো সে একটা বড়ো বাড়ি। সেখানে গিয়ে সাহায্য চাইবে ঠিক করলো, কিন্তু বাড়ির গেট পেরিয়ে বাগানের মধ্যে পা দিতেই চমকে উঠলো সে—এই বাড়িতেই তো কাল রাতে তারা ডাকাতি করতে এসেছিলো। প্রথমে সে ভাবলো, পালিয়ে যাবে, কিন্তু পালিয়ে যাবেই-বা কোথায়? শেষ পর্যন্ত সে এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লো, কিন্তু শরীরের দারুণ দুর্বলতার জন্যে আবার বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে গেল।

* * *

সাইক্‌স্ যে-বাড়িতে অভিযান করেছিলো, গাইল্‌স্ সে-বাড়ির খানসামা এবং ব্রিট্‌ল্‌স্ হলো 'বয়' বা বালক-ভৃত্য। বালক-বয়সেই ওই-বাড়িতে কাজে লেগেছিলো ব্রিট্‌ল্‌স্, কিন্তু এখন তার বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেলেও তার 'বয়' নাম ঘোচেনি! এরা দুজন পুরুষ ছাড়া বাড়ির বাসিন্দারা সকলেই স্ত্রীলোক, তবে আর একজন বাইরের লোক দুটো কুকুর নিয়ে রাত কাটাতো ওই বাড়ির রোয়াকে শুয়ে। সে হলো একজন ঝালাইওলা।

সাইক্‌স্ ও তার সঙ্গীদের পেছনে রাতে ধাওয়া করেছিলো ওই তিনজন লোক, সঙ্গে দুটো কুকুর নিয়ে! অনেকটা দূর ধাওয়া ক'রে এসে কি ভেবে তারা পরামর্শ করার জন্য থামলো।

দলের সবচেয়ে মোটা লোকটা বললোঃ "আমার মতে এখন বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল। চলো, আমরা বাড়ি ফিরে যাই।"

একথা শুনে দ্বিতীয় লোকটার মুখে আতঙ্কের ছায়া ফুটে ওঠে। সে কাঁপা গলায় বললোঃ "মিস্টার গাইল্‌সের মতই আমার মত।"

তৃতীয় লোকটা বললোঃ "মিস্টার গাইল্‌সের কথার প্রতিবাদ করার কোনো অধিকার নেই আমার।" কথা বলার সময়ে তার দাঁতগুলো ঠকঠক ক'রে কাঁপছিলো।

"তুমি ভয় পেয়েছো, ব্রিট্‌ল্‌স্", গাইল্‌স্ বললো।

ব্রিট্‌ল্‌স্ বললোঃ "ভয় পেয়েছি! কৈ, না তো!"

—"তুমি মিথ্যুক।"

ব্রিট্‌ল্‌স্ বললোঃ "আপনি মিথ্যাবাদী, মিস্টার গাইল্‌স্!"

তর্কাতর্কির অবসান ক'রে দিলে ঝালাইওলা। সে বললোঃ "সত্যি কথা বলতে কি, আমরা সবাই ভয় পেয়েছি।"

তারপর তিনজনে পরস্পরের গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ভয়ে-ভয়ে ফিরে চললো বাড়ির দিকে। তখন ভোর হয়ে গেছে। ফিরে এসে তারা রান্নাঘরে ব'সে চা খেতে খেতে গত রাতের ঘটনা আলোচনা করছিলো। গাইল্‌স্ বাড়ির প্রধান পরিচারক, তাই সে নিজের মর্যাদা বজায় রাখার জন্যে সবসময় গম্ভীর হয়ে থাকে, আর অন্য সব চাকর-বাকরদের এড়িয়ে চলে। কিন্তু রাতের রোমাঞ্চকর ডাকাত ধরার অভিযানের নেতৃত্ব করেছে বলে সে আজ তার গাম্ভীর্যের মুখোস খসিয়ে সবার সাথে একসঙ্গে বসেছে। বাড়ির ঝি আর রাঁধুনী হাঁ ক'রে গিলছিলো তার কথাগুলো।

গাইল্‌স্ বলছিলোঃ "রাত তখন বোধহয় দুটো হবে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে জেগে উঠলুম। প্রথমে ভাবলুম, স্বপ্ন দেখছি। এমন সময় আবার শব্দ হলো। তখন বিছানার ওপর উঠে বসলুম।"

"কী সব্বোনাশ।" রাঁধুনী আর ঝি একসঙ্গে একথা ব'লে আর একটু কাছ-ঘেঁষে বসলো গাইল্‌সের।

ভারিক্কী চালে গাইল্‌স্ আবার বলতে লাগলোঃ "ঠিক করলুম, ব্রিট্‌ল্‌স্ বেচারাকে ডেকে তুলতে হবে, নইলে ওকে ডাকাতরা হয়তো ঘুমন্ত অবস্থায় খুন ক'রে রেখে যাবে—ও হয়তো টেরও পাবে না। তাই চুপিচুপি উঠে গিয়ে ওকে ডেকে তুলে বললুম, 'ভয় পাস্‌নে'।"

রাঁধুনী জিজ্ঞাসা করলোঃ "তা, ও কি ভয় পেলো?"

গাইল্‌স্ বললোঃ "মোটেই না। ও প্রায় আমারই মতো সাহসী কিনা!"

ঝি বললোঃ "আমি হ'লে কিন্তু তখনি ভয়ে মরে যেতুম।"

ব্রিট্‌ল্‌স্ বললোঃ "তুমি যে মেয়েছেলে!"

গাইল্‌স্ সায় দিয়ে বললোঃ "ঠিকই বলেছ ব্রিট্‌ল্‌স্! মেয়েমানুষের কাছে ভয় ছাড়া আর কিই-বা আশা করা যায়!"

ঠিক এ সময়ে বাড়ির সদর-দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হ'তেই গাইল্‌স্ এবং অন্য সবাই চমকে উঠলো। ঝি আর রাঁধুনী ভয়ে আঁতকে উঠলো।

গাইল্‌স্ বললোঃ "দরজাটা খুলে দাও কেউ!"

কিন্তু ভয়ে কেউ নড়লো না। গাইল্‌স্ সবার ভয়ার্ত মুখের ওপরে চোখ বুলিয়ে আবার বললোঃ "এত ভোরে কড়া নাড়ছে কে? ভারী সন্দেহের কথা! যাক্, দরজাটা খুলে দাও কেউ।"

এই ব'লে গাইল্‌স্ ব্রিট্‌ল্‌সের দিকে তাকালো, কিন্তু ব্রিট্‌ল্‌স্ তার মুখ-চোখে এমন ভাব দেখালো যে, গাইল্‌স্ যেন কখনও তাকে এতবড়ো কাজের ভার দিতে পারে না। ঝালাইওলাকে দেখা গেল, সে যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। আর মেয়েরা তো ভয়ে জড়সড়।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে গাইল্‌স্ বললোঃ "ব্রিট্‌ল্‌স্ যখন ভয় পাচ্ছে তখন আমি বলি কি, তার সঙ্গে আমরাও সকলে একসাথে যাই···কি বল হে তোমরা?"

হঠাৎ ঘুমিয়ে-পড়া ঝালাইওলা জেগে উঠে বললোঃ "আমি এতে রাজী আছি।"

শেষপর্যন্ত সবাই একসাথে জড়াজড়ি করে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললো।

অলিভারকে দেখে গাইল্‌স্ সবিস্ময়ে ব'লে উঠলোঃ "আরে, এ যে সেই বিচ্ছু ডাকাতটাঃ একে চিনতে পারছো না, ব্রিট্‌ল্‌স্?"

"তাইতো! তাইতো!" বলে সকলে ভয়ে পিছিয়ে গেল, কিন্তু গাইল্‌স্ অলিভারকে চ্যাংদোলা ক'রে বাড়ির ভেতরে এনে মেঝের ওপরে শুইয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলোঃ "মা-ঠাক্‌রুন! দিদিমণি! ডাকাত ধরেছি। কাল এটাকেই গুলি করেছিলুম।"

একজন তরুণী এসে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ালো এবং অলিভারকে না দেখেই ব্রিট্‌ল্‌স্‌কে পাঠিয়ে দিলো ডাক্তার আর পুলিশ ডেকে নিয়ে আসার জন্যে।

সকালের জলখাবার খেতে বসলেন দু'জন মহিলা—একজন বৃদ্ধা, অপরজনের বয়স সতেরো বছরেরও কম। তরুণীটি ভারী সুন্দরী। তাদের পরিবেশন করতে লাগলো গাইল্‌স্।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেনঃ "ব্রিট্‌ল্‌স্ কতক্ষণ হলো গেছে?"

গাইল্‌স্ ঘড়ি দেখে বললোঃ "এক ঘণ্টা বারো মিনিট হলো, মা।"

বৃদ্ধা বললেন : "ভারী কুঁড়ে ও।"

গাইল্‌স্ বললো : "ব্রিট্‌ল্‌স্ ছেলেটা চিরকালই ওরকম।"

মৃদু হেসে তরুণীটি বললো : "ছেলেটা রাস্তায় আবার অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলতে শুরু ক'রে দেয়।"

তরুণীটির তামাশা বুঝতে পেরে গাইল্‌স্‌ও হেসে ফেললো। এমন সময়ে একজন মোটা ভদ্রলোক বড়ো বড়ো পা ফেলে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে ব'লে উঠলেন : "আঃ! মিসেস্ মেইলি! শুনলুম, কাল রাত্তিরে আপনার বাড়িতে নাকি ডাকাত পড়েছিলো? আমাকে খবর দিলেন না কেন? কী সাংঘাতিক! রাত্তিরবেলা বাড়ি চড়াও! আঃ মিস্ রোজ্!"

যিনি একথা বললেন, তিনি হলেন ডাক্তার লস্‌বার্ন।

তরুণী মিস্ রোজ্ তখনি ডাক্তারকে অলিভারের কাছে পাঠিয়ে দিলো। রোগী দেখতে অনেকক্ষণ সময় লাগলো ডাক্তারের। তারপর তিনি নীচে নেমে এসে মিসেস্ মেইলী ও মিস্ রোজ্‌কে নিয়ে গেলেন ওপরে অলিভারকে দেখাবার জন্যে।

মৃদু-পায়ে তাঁরা ঢুকলেন অলিভারের ঘরে। রোজ্ অলিভারের কাছে গিয়ে তার চুলগুলো গুছিয়ে দিতেই সে ছলছল চোখে তাকিয়ে রইলো।

মিসেস্ মেইলী বললেন : "বেচারা এমন ছেলে কখনোই ডাকাত দলের লোক হ'তে পারে না।"

ডাক্তার বললেন : "যে যতই বেচারা হোক্, বাইরের চেহারা দেখে বলা যায় না, কার মনে কি আছে!"

রোজ্ বললো : "তা ব'লে এত কম বয়সে?"

ডাক্তার বললেন : "কম বয়সেই তো ছেলেমেয়েরা সব-চেয়ে সহজে পাপের খপ্পরে পড়ে।"

রোজ্ বললো : "হয়তো মায়ের ভালবাসা বা বাড়ির সুন্দর পরিবেশ এর কপালে কোনোদিন জোটেনি। হয়তো অনাদর, অত্যাচার আর পেটের জ্বালাতেই ও খারাপ লোকেদের সঙ্গে মিশেছে। যাই হোক্, ওকে জেলে পাঠিয়ো না পিসীমা! দয়া করো ওকে!"

কিশোর অলিভারকে দেখেই রোজের মতো মিসেস্ মেইলীর অন্তরও গলে গিয়েছিলো। তাই রোজ্ অনুরোধ করার সঙ্গে-সঙ্গেই অলিভারকে জেলের দায় থেকে কি উপায়ে বাঁচানো যায়, সে বিষয়ে ডাক্তার লস্‌বার্নের কাছে পরামর্শ চাইলেন।

বেশ খানিকক্ষণ ভেবে-চিন্তে ডাক্তার লস্‌বার্ন জানালেন যে, তিনি

ছেলেটাকে বাঁচাতে পারবেন, তবে গাইল্স্‌কে আর ব্রিট্‌ল্‌স্‌কে ধমকাবার অধিকার দিতে হবে তাঁকে। অবশ্য, সেই অযথা ধমকানির মূল্য হিসেবে মিসেস্ মেইলী তাদের নাহয় কিছু বক্‌শিস দেবেন। ডাক্তার আরও জানালেন যে, তিনি আগে থেকে কিছুটা কাজ এগিয়ে রেখেছেন—অলিভারের অবস্থা সংকটজনক ব'লে কনস্টেবলকে ঠেকিয়ে রেখেছেন—অলিভারের সঙ্গে তাকে দেখা করতে দেননি।

মিসেস্ মেইলী ও রোজ্‌ ডাক্তারের শর্ত মেনে নিলেন।

গাইল্স্ নীচে রান্নাঘরে মজলিস জাঁকিয়ে বসেছিলো। ব্রিট্‌ল্স্, ঝালাইওলা, রাঁধুনী আর ঝিয়ের কাছে তার অসীম সাহসের কাহিনী বলছিলো সে। কনস্টেবলও ছিলো সেখানে। এমন সময়ে ডাক্তার লস্‌বার্ন গিয়ে সেখানে হাজির হলেন।

দু'-একটা মামুলী কথার পরে ডাক্তার বললেন : "আমার ভয় হচ্ছে, গাইল্স্ তুমি ভুল করছো। আচ্ছা, তুমি শাস্ত্র মানো তো?"

—"মানি বৈকি!" গাইল্স্ বললো।

—"আর তুমি ব্রিট্‌ল্স্?"

—"নিশ্চয়ই। মিস্টার গাইল্স্ যা মানেন, আমিও তা মানি", জানালো ব্রিট্‌ল্স্।

ডাক্তার তখন বেশ ঝাঁজের সুরেই বললেন : "ভালো! আচ্ছা, তোমরা কি হলফ ক'রে বলতে পারো যে, ওপরের ঘরে যে-ছেলেটা আছে, সে-ই কাল রাতে এ বাড়িতে ঢুকেছিলো? মনে রেখো, তোমাদের অনুমান যদি ভুল হয়, তাহলে ভগবান যমদূত পাঠিয়ে তোমাদের শায়েস্তা করবেন। কনস্টেবল, এদের জবাবটা শুনে রাখো!"

গাইল্স্ আর ব্রিট্‌ল্স্ দু'জনে দু'জনের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এমন সময়ে সদর দরজায় কড়া ন'ড়ে উঠলো…দারোগাবাবু এসেছেন।

দারোগা ব্ল্যাদার্স্ আর তাঁর সহকারী ডাফের কাছে বেশ ধীরে-সুস্থে ডাক্তার লস্‌বার্ন গতরাতের সব কাহিনী বললেন।

দারোগা বললেন : "এ নিশ্চয়ই লাঙলের কাজ নয়, কি বলো, ডাফ্?"

—"নিশ্চয়ই না।" সহকারী ডাফ্ দারোগার মত মেনে নিলেন।

ডাক্তার বললেন : 'লাঙল' বলতে আপনারা যদি গেঁয়ো-লোক বোঝাতে চান তো, বলবো, ঠিকই অনুমান করেছেন আপনারা—এটা গেঁয়ো-লোকের কাজ নয় মোটেই।"

তারপর ব্ল্যাদার্স্ জিজ্ঞাসা করলেন : "আচ্ছা, যে-ছোঁড়াটাকে চাকরেরা ধরেছে বলছিলো—"

লস্‌বার্ন বললেন : "বাজে কথা। ভয় পেয়ে তারা যা-তা বলেছে। সে-ছেলেটার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এ-ডাকাতির।"

লস্‌বার্নের কথা মেনে নিলেও দারোগা কিন্তু অলিভারকে জেরা ক'রে তার পরিচয় জানার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন : "ছোঁড়াটা কে? এলো কোত্থেকে? সে তো আর আকাশ থেকে খ'সে পড়েনি!"

ডাক্তার লস্‌বার্ন দারোগাকে বললেন : "ছেলেটা এমন মারাত্মকভাবে অসুস্থ যে, ডাক্তার হিসেবে আমি এখন কিছুতেই তাকে উত্ত্যক্ত করার অনুমতি দিতে পারি না। তার সঙ্গে দেখা করতে হ'লে আপনাকে দু'চারদিন অপেক্ষা করতে হবে।"

একথা শুনে দারোগা ঠিক করলেন যে, আগে তিনি বাড়ির চাকর-বাকরদের জেরা করবেন এবং ডাকাতরা কোন্ পথে এসেছিলো তা পরীক্ষা করে দেখবেন।

ডাক্তার লস্‌বার্নের কাছে ধমক খেয়ে গাইল্‌স্ ও ব্রিট্‌ল্‌স্ এমন ঘাবড়ে গিয়েছিলো যে, তারা দারোগার জেরার উত্তরে উলটো-পালটা এজাহার দিলো। ফলে, অলিভারের ওপর পুলিশ-কর্মচারীদের সন্দেহ একেবারে পাতলা হয়ে গেল।

চাকর-বাকরদের জেরা শেষ হয়ে গেলে, দারোগা ব্ল্যাদার্স্ আর তাঁর সহকারীকে পেট ভ'রে মদ খাইয়ে দিলেন ডাক্তার। তাঁদের মন থেকে অলিভারের ওপর সন্দেহ তখন মুছে গেছে। তাঁরা তখন এ-ডাকাতি কোন্ দলের কাজ তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন।

দারোগা বললেন : "এটা সেই শাঁখারী-ব্যাটার কাজ।"

সহকারী ডাফ্ বললেন : "না, এ-কাজ সেই ঘরামী-ব্যাটার।"

চ'লে যাবার আগে পুলিশ-কর্মচারীরা অলিভারকে দেখলেন বটে, কিন্তু ডাক্তারের কথামতো তাকে কোনো জেরা করলেন না। তাঁরা শুধু এই শর্ত করলেন যে, একান্ত এড়ানো না গেলে অলিভারকে আদালতে একবার হাজির হ'তে হবে এবং সে যাতে হাজির হয়, তার জন্যে মিসেস্ মেইলী ও ডাক্তার লস্‌বার্ন জামিন থাকবেন। ডাক্তার আর মিসেস্ মেইলী এ-শর্ত মেনে নিলেন। তারপর পুলিশ-কর্মচারী দু'জনে চলে যাওয়ার সময়ে তাঁদের হাতে একটা ক'রে গিনি গুঁজে দিলেন ডাক্তার লস্‌বার্ন।

* * *

অলিভারের অসুখটা সহজ ছিলো না, তাই সারতেও বেশ সময় লাগলো। কয়েক সপ্তাহ পরে সে একটু সুস্থ হবার পর যাঁরা তাকে আশ্রয় দিয়েছেন তাঁদের দয়ার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের দুঃখময় জীবনের করুণ কাহিনী তাঁদের কাছে জানালো। তারপর দুটো ছোটো হাত জোড় ক'রে সে তাঁদের কাছে কাতর আবেদন জানালো, যেন তাঁরা আর তাকে ফেলে না দেন। সে বারবার বলতে লাগলো যে তাঁরা তাঁকে যে কাজ করতে দেবেন, হাসি-মুখে সেই কাজ করতে সে রাজী আছে।

অলিভারের কাহিনী শুনে রোজের চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো। আর তার মন সহানুভূতিতে ভরে গেল। অলিভারকে আশ্বাস দিয়ে সে বললো ঃ "আমাদের খুশী করার জন্যে তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। যে-শোচনীয় অবস্থায় তোমার জীবন কেটেছে ব'লে আমাদের জানিয়েছো, তা থেকে পিসীমা যে তোমাকে উদ্ধার করতে পেরেছেন, তাতেই আমি খুশী হয়েছি। যদি দেখতে পাই যে, তিনি অপাত্রে করুণা করেননি, তাহলে আমার যে কী আনন্দ হবে তা তুমি ধারণাও করতে পারো না।"

কথায়-কথায় অলিভার জানালো যে, মিস্টার ব্রাউন্‌লোর সঙ্গে দেখা করার জন্যে সে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক হয়তো তাকে বেইমান জোচ্চোর ভাবছেন।

রোজ্ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো যে, আর-একটু ভালো হয়ে উঠলেই সে নিজে গিয়ে মিস্টার ব্রাউন্‌লোর সঙ্গে দেখা করতে পারবে।

কিছুদিনের মধ্যেই অলিভার বেশ সেরে উঠলো। তখন একদিন মিসেস্ মেইলীর ঘোড়ার গাড়িতে চেপে সে ডাক্তার লস্‌বার্নকে নিয়ে মিস্টার ব্রাউন্‌লোর সঙ্গে দেখা করার জন্যে বেরিয়ে পড়লো।

সেখানে পৌঁছে প্রথমেই সে বাড়ি ভুল ক'রে বসলো। তারপর বহুকষ্টে যদিই-বা খুঁজে পেলো মিঃ ব্রাউন্‌লোর বাড়ি, কিন্তু হায়! সে বাড়ির বারান্দায় সাইন্‌বোর্ড ঝুলছে ঃ "বাড়িটা ভাড়া দেওয়া হবে!"

তখন ডাক্তার লস্‌বার্নের পরামর্শে পাশের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, মিঃ ব্রাউন্‌লো তাঁর সব জিনিসপত্র বেচে দিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে চ'লে গেছেন। তাঁর পরিচারিকা এবং তাঁর নিত্যসঙ্গী এক বন্ধুও তাঁর সহযাত্রী হয়েছেন।

হতাশায় ভেঙে পড়লো অলিভার। রোগশয্যায় শুয়ে-শুয়ে সে কল্পনার জাল বুনেছিলো। তোকে দেখতে পেলে মিঃ ব্রাউন্‌লো এবং মিসেস্ বেডুইনের কী আনন্দই-না হবে! শেষ পর্যন্ত সে বইওলার কাছে গিয়ে

খবর নেওয়ার কথা বলতেই, ডাক্তার লস্‌বার্ন বললেনঃ "এত আশা ক'রে যখন বিফল হওয়া গেল, তখন আর চেষ্টা ক'রে কোনো লাভ নেই। বইওলার খোঁজে গিয়ে দেখবে, হয়তো সে মারা গেছে, নয়তো সে নিজের ঘরে আগুন দিয়ে পালিয়ে গেছে। নাঃ, আর নয়! এবার সিধে বাড়ি ফিরে চলো।"

নিরুপায় অলিভার অগত্যা বাড়ি ফিরলো। তার তখন যা মনের অবস্থা, তা একমাত্র তার অন্তর্যামীই জানতেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দিন-পনেরো পরে মিস্ রোজ্ ও অলিভারকে নিয়ে মিসেস্ মেইলী তাঁর পল্লী-ভবনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন।

এখানে এসে অলিভারের মন খুশীর আমেজে ভ'রে গেল। খোলা বাতাস, সবুজঘাসে-মোড়া ছোটো-ছোটো পাহাড়—চারদিকের এই সবুজের সমারোহ তার চোখে মায়া-কাজল টেনে দিলো। নিকটেই এক মনোরম ছোটো গির্জা, তার প্রাঙ্গণে এখানে-ওখানে কতকগুলো সমাধি। অলিভার প্রায়ই সেসব সমাধিক্ষেত্রের ধারে-ধারে ঘুরে বেড়াতো এবং তার মায়ের কথা মনে ক'রে চোখের জল ফেলতো।

এখানে পরম শান্তিতে কাটতে লাগলো অলিভারের দিনগুলো। রোজ সকালে গির্জার কাছে এক প্রবীণ জ্ঞানী লোকের কাছে সে পড়তে যেতো। বিকেলে মিসেস্ মেইলী ও মিস্ রোজের সঙ্গে সে বেড়াতো। ওঁরা নানা বই নিয়ে আলোচনা করতেন, আর একমনে সে শুনতো। কোনো-কোনো দিন গাছের ছায়ায় ব'সে আঁধার ঘনিয়ে না-আসা পর্যন্ত সে মিস্ রোজের বই-পড়া শুনতো। এর মাঝে কখনো যদি তাঁরা অলিভারকে ফুল তুলে আনতে বলতেন, সে খুশী হয়ে ছুটে গিয়ে হুকুম তামিল করতো। সন্ধ্যার পর তাঁরা বাড়ি ফিরতেন। পিয়ানো বাজিয়ে চমৎকার মিষ্টি গলায় মিস্ রোজ্ গান গাইতো—অলিভার মুগ্ধ হয়ে সে-গান শুনতো।

সবচেয়ে ভালো লাগতো তার রবিবারের দিনটা। সারা গাঁয়ের লোক এসে সকালবেলায় জড়ো হতো গির্জার প্রার্থনা-সভায়। তারা দরিদ্র হলেও তাদের অনাবিল-হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে সকলের সঙ্গে প্রার্থনা-সংগীত গাইতো।

অলিভারের কিন্তু কাজের অন্ত ছিলো না। ঘর সাজাবার জন্যে ফুল-কুড়োনো, মিসেস্ মেইলীর পাখিদের জন্যে খাঁচা তৈরি করা, গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে মিশে ক্রিকেট খেলা, আর পাড়ার জানা-লোকেদের টুকি-টাকি ফাই-ফরমাশ খাটা ইত্যাদি কাজ সে বেশ আনন্দের সঙ্গেই করতো।

এভাবে তিনমাস কেটে গেল। ধীরে ধীরে অলিভার মিসেস্ মেইলীর পরিবারেরই একজন হয়ে উঠলো। তার ব্যবহারে বাড়ির লোকেরা ভুলে গেল যে, সে কয়েকমাস আগেও ছিলো তাদের একেবারে অচেনা—তাদের কেউ নয়।

বসন্ত এলো আর গেল। তারপরে এলো গ্রীষ্ম। গ্রামখানা আরও সুন্দর, আরও মধুর হয়ে উঠলো।

সেদিন দিনের বেলা হঠাৎ খুব গরম পড়েছিলো। রাতে বেশ সুন্দর হয়ে দেখা দিলো চাঁদ এবং মৃদু-মন্দ বাতাস বইলো। অলিভার, মিসেস্ মেইলী ও রোজ্ বেড়িয়ে বাড়ি ফিরলেন। রোজ্ পিয়ানোর সাম্‌নে ব'সে আচ্ছন্নের মতো যন্ত্রটার চাবি টিপতে-টিপতে হঠাৎ বাজনা থামিয়ে কেঁদে উঠলো।

বিস্ময়ে রোজের মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস্ মেইলী বুঝতে পারলেন যে, রোজ্ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। রোজ্‌ও তাই বললো। মিসেস্ মেইলী তখন গান গাইতে বারণ ক'রে, রোজ্‌কে শুতে পাঠিয়ে দিলেন।

রোজের অসুস্থতায় শুধু মিসেস্ মেইলী উৎকন্ঠিত হলেন না—অলিভারও দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ পরে মিসেস্ মেইলী অলিভারকে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন: "অলিভার, এখন মুখভার করে বসে থাকলে চলবে না আমাদের। এই চিঠিখানা খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে হবে ডাক্তার লস্‌বার্নের কাছে। এখান থেকে মাইল-চারেক দূরে গঞ্জে এখানা নিয়ে যেতে হবে। সেখানে সরাইখানায় লোক আছে। তাদের কাছে চিঠিটা দিলে তারা ঘোড়ায় চেপে চিঠিখানা তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। আমি বিশ্বাস করি যে, তুমি এ-কাজ ঠিকমতো করতে পারবে।"

অলিভার কোনো জবাব দিলো না—তখনি চিঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ার জন্যে তার চোখে-মুখে দারুণ অস্থিরতা ফুটে উঠলো।

মিসেস্ মেইলীর হাতে আরও একখানা চিঠি ছিল। সে-খামের ওপরে হ্যারী মেইলীর নাম লেখা। মিসেস্ মেইলী জানালেন যে, কাল পর্যন্ত রোজের অবস্থা না দেখে তিনি এ-চিঠিখানা পাঠাবেন না।

চিঠি আর পথ-খরচের টাকা নিয়ে অলিভার বেরিয়ে পড়লো। তার সাধ্যমতো তাড়াতাড়ি চলতে লাগলো সে। অনেক মাঠ-ঘাট পেরিয়ে ছুটতে-ছুটতে এসে হাজির হলো 'জর্জ' নামে এক সরাইখানায়। সেখানে অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে তখনি একজন ডাকবাহী ঘোড়সওয়ারকে পাঠিয়ে দিলো চিঠি নিয়ে ডাক্তার লস্‌বার্নের কাছে।

কাজটা ভালোভাবে শেষ হয়ে গেলো দেখে আনন্দে সে সরাইখানা থেকে বেরোবার মুখে একজন ঢ্যাঙা লোকের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে অলিভার সঙ্গে-সঙ্গে তার কাছে ক্ষমা চাইলো।

লোকটা কিন্তু ঝাঁজিয়ে উঠে বললো : "আরে-আরে, এটা আবার কে রে? আ-ম'লো যা!" এই বলে সে অলিভারকে ভালোভাবে নজর করেই চেঁচিয়ে উঠলো : "আরে—এ যে আমাদের সেই হারানিধি! ওরে বাব্বাঃ! কে ভেবেছিলো যে, আবার ও কবর থেকে উঠে এসে আমার পথের কাঁটা হবে!" এই ব'লে ঘুষি-পাকিয়ে অলিভারের দিকে তেড়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে সে নিজেই বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে গেল। তার শরীরটা সাপের মতো মোচড়াতে লাগলো, আর তার মুখ থেকে ফেনা বেরুতে লাগলো।

অলিভার তাড়াতাড়ি সরাইখানার লোকজনদের ডেকে আনলো ওই লোকটার সেবা করার জন্যে। তারপর অবাক্ হয়ে লোকটার অদ্ভুত আচরণের কথা ভাবতে-ভাবতে বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিলো সে।

বাড়ি এসে জানলো, মিস্ রোজের অবস্থা খুব খারাপ, অসুখটা হঠাৎ মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে।

ডাক্তার লস্‌বার্ন সেদিন গভীর রাতে এসে পৌঁছোলেন। রোগিণীকে পরীক্ষা ক'রে তিনি জানালেন যে, জীবনের আশা খুবই কম; তাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে—এ ঘুম-ভাঙার সাথে সাথে হয় সে মারা যাবে, নয় তো সে ভালোর দিকে যাবে।

এ-কথা শুনে সারাটা রাত, সারাটা দিন অলিভার ও মিসেস্ মেইলী দুরুদুরু বুকে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন আলাদা-আলাদা ঘরে। তাঁদের খাবার পর্যন্ত প'ড়ে রইলো।

সন্ধ্যা উতরে গেলে, ঘরের বাইরে পায়ের আওয়াজ শুনে তাঁরা দু'জনে দরজার কাছে ছুটে গেলেন। ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার লস্‌বার্ন।

ব্যাকুল-কণ্ঠে মিসেস্ মেইলী জিজ্ঞাসা করলেন : "কি খবর রোজের? —বলুন—বলুন।"

কড়া ধমক দিয়ে বলে উঠলেন ডাক্তার লস্‌বার্ন ঃ "থামুন ! ভগবানের অসীম করুণা—রোজ্‌ এখনও অনেক বছর বাঁচবে।"

ডাক্তারের কথায় ওঁরা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন।

রাত ঘনিয়ে আসছিলো। রোগিণীর ঘর সাজাবার জন্যে কতকগুলো ফুল যোগাড় করে বাড়ি ফিরছিলো অলিভার। এমন সময় একখানা চলন্ত ঘোড়ার গাড়ি তার কাছে এসে হঠাৎ থেমে গেল। গাড়ির ভেতর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো ঃ "এই অলিভার ! খবর কি ? মিস্‌ রোজ্‌ কি রকম আছেন ?"

রোজের নাম শুনেই গাড়ির কাছে ছুটে গিয়ে অলিভার বললো ঃ "কে, গাইলস্‌ নাকি ?"

গাইল্‌স্‌ কি-যেন বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এক যুবক সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলো ঃ "এক-কথায় বলো,—ভালো, না মন্দ ?"

অলিভার তাড়াতাড়ি জবাব দিলো ঃ "ভালো—অনেক ভালো।"

—"জয় ভগবান !" যুবক আনন্দে লাফিয়ে উঠলো—"ঠিক বলছো তো খোকা ? আমাকে ঠকাচ্ছো না তো ?"

অলিভার বললো ঃ "না স্যার, ঠিকই বলছি—ডাক্তার বলেছেন, অনেক দিন বাঁচবেন তিনি।"

যুবক তখন গাইল্‌স্‌কে বললো ঃ "তুমি গাড়ি ক'রে গিয়ে আগে মাকে খবর দাও, আমি হেঁটে যেতে-যেতে মনটা একটু ঠিক ক'রে নিই।"

গাইল্‌স্‌ বললো ঃ "মাফ করবেন, মিস্টার হ্যারী ! খবর দেওয়ার ভারটা কোচোয়ানের ওপরই দিন। আমি এ-বেশে ঝি-চাকরানীদের সামনে গেলে তারা আর আমাকে মানবে না।"

মৃদু হেসে হ্যারী বললো ঃ "বেশ ! তবে আগে তোমার ওই টুপিটা বদলে ফেল, নইলে লোকে পাগল ভাববে !"

গাইল্‌স্‌ চটপট তার টুপি বদলে নিলো। তারপর কোচোয়ানকে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যেতে ব'লে তারা তিনজনে ধীরে ধীরে হেঁটে চললো।

মিসেস্‌ মেইলীর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র হ্যারী ব'লে উঠলো ঃ "আমাকে আগে কেন চিঠি দাওনি, মা ?"

মিসেস্‌ মেইলী বললেন ঃ "দেবো ভেবেছিলুম, কিন্তু ডাক্তার লস্‌বার্নের অভিমত জানার আগে তোমাকে চিঠি দেওয়া উচিত বলে মনে করিনি।"

ডাক্তার লস্‌বার্নও ঘরে ছিলেন। তিনি হ্যারীকে রোগের পুরো বিবরণ দিলেন। তারপর গাইল্‌স্‌কে বললেন: "কি হে গাইল্‌স্‌, এর মধ্যে আর-কাউকে গুলি-টুলি করেছো নাকি?"

ডাক্তার তামাশা করছেন বুঝতে পেরে লজ্জা পেলো গাইল্‌স্‌। সে আমতা-আমতা করে বললো: "না, তেমন বিশেষ কাউকে নয়।"

—"চোর-টোরও ধরোনি?"

—"না স্যার।"

—"বড়ই হতাশ হলাম শুনে। সেবার অমন ডাকাত ধরেছিলে কিনা,...যাক্‌ ব্রিট্‌ল্‌স্‌ কেমন আছে?"

—"ভালোই আছে ছেলেটা,—আপনাকে সে ধন্যবাদ জানিয়েছে স্যার!"

—"ভালো, ভালো। এদিকে শোনো। তোমার জন্যে একটা ভালো খবর আছে গাইল্‌স্‌," এই ব'লে ডাক্তার লস্‌বার্ন তাকে ঘরের কোণে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস ক'রে কি যেন সব বললেন। শুনেই গাইল্‌স্‌ ছুটে গেল রান্নাঘরে,—অন্যান্য চাকর-বাকরকে ডেকে এনে নিজের পয়সায় খাইয়ে দিলো তাদের। এরপর নিজের বাহবা জাহির করে সে সকলকে জানালো যে, ডাকাতির রাতে সে যে সাহস দেখিয়েছিলো, তার জন্যে মনিব ঠাকরুন তাঁকে পঁচিশ পাউণ্ড বকশিশ দিয়েছেন।

পরদিন থেকে রোজ সকালে অলিভার মিস্‌ রোজের ঘর সাজাবার জন্যে ফুল তুলতে যেতো। হ্যারী মেইলীও তার সঙ্গী হতো। মিস্‌ রোজ্‌ ধীরে-ধীরে সেরে উঠতে লাগলো।

আজকাল অলিভারের হাতে তেমন কাজ না থাকায় সে গভীরভাবে পড়াশুনায় মন দিলো। তারপর এত তাড়াতাড়ি পড়াশুনোয় সে এগিয়ে গেল যে, সে নিজেই অবাক্‌ হয়ে গেল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা জানালার ধারে ব'সে পড়তে-পড়তে অলিভার তন্দ্রায় ঝিমিয়ে পড়েছিলো। তন্দ্রার ঘোরে তার মনে হলো—সে যেন স্বপ্ন দেখছে, চারদিকে কেমন যেন গুমোট...সে যেন ফের ফ্যাগিনের আড্ডায় গিয়ে পড়েছে, তার সামনেই ব'সে আছে ফ্যাগিন্‌ আর অপর কে একজন লোক। লোকটা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে আছে, যেন কেউ তাকে না দেখতে পায়! অলিভারের মনে হলো—সে যেন ফ্যাগিনের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে...ফ্যাগিন্‌ যেন বলছে: "চুপ, সেই ছোঁড়াটাই বটে! চ'লে

এসো।” অপর লোকটা বলছেঃ “সে-ই বটে! আমি কি ওকে ভুল করতে পারি? একদল ভূত যদি ওর মত চেহারা ক’রে ওর সঙ্গে মিশে বসে থাকে, তবুও আমি ওকে চিনে বের করতে পারবো! পঞ্চাশ ফুট মাটির তলায় ওকে কবর দিয়ে আমাকে যদি সে-কবরের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাও, তাহ’লেও আমি টের পাবো যে ওকে ওখানে কবর দেওয়া হয়েছে।”

কথাগুলোর মধ্যে এমনি একটা ভয়ংকর আক্রোশের ভাব ফুটে উঠেছিলো যে, আতঙ্কে অলিভারের তন্দ্রা ভেঙে গেলে সে চমকে উঠে বসলো। সে সত্যি সত্যি দেখলো, দু’জন লোক যেন জানালার পাশ থেকে স’রে যাচ্ছে! তার সমস্ত রক্ত বুকের কাছে যেন জমা হতে লাগলো,—বাক্‌রোধ হয়ে গেল! ওই…ওই জানালার ওপাশে…হাত বাড়ালেই সে হয়তো তাদের ছুঁতে পারে! অলিভার স্পষ্ট দেখলো, ফ্যাগিন্ দাঁড়িয়ে উঁকি মারছে, আর তার পাশে দাঁড়িয়ে সরাইখানায় বেহুঁশ হয়ে-যাওয়া সেই লোকটা!

একটা নিমেষ মাত্র! তারপরই তারা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল! অলিভার এক মুহূর্ত সেদিকে অপলকে তাকিয়ে রইলো, তারপর জানালা ডিঙিয়ে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে প’ড়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

অলিভারের চেঁচামেচি শুনে বাড়িসুদ্ধ লোক ছুটে এলো। একগাছা মোটা লাঠি হাতে তুলে নিয়ে হ্যারী মেইলী ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলোঃ “কোন্ দিকে গেছে ওরা?”

আঙুল বাড়িয়ে অলিভার বললোঃ “ওই দিকে।”

—“তাহ’লে খানার মধ্যে গিয়ে লুকিয়েছে। যত তাড়াতাড়ি পারো, আমার পেছনে ছুটে এসো!” ব’লে হ্যারী এক লাফে ঝোপ ডিঙিয়ে তীরের মতো ছুটে চললো। গাইল্‌স্ এবং ডাক্তার লসবার্নও ছুটলেন।

কিন্তু সমস্তই বিফল হলো। কাউকেই আশে-পাশে কোথাও দেখা গেল না।

হ্যারী বললোঃ “তুমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছো, অলিভার!”

অলিভার জোর গলায় বললোঃ “না-না স্বপ্ন নয়—আমি স্পষ্টই দেখেছি—দু’জনকেই দেখেছি।”

—“দু’জন কে কে?” হ্যারী ও লস্‌বার্ন একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন।

—“ফ্যাগিন্ আর যে-লোকটা সরাইখানায় আমাকে মারতে এসে নিজে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল!”

এ-কথা শুনে আবার চারদিক খুঁজে দেখা হলো এবং তার পরদিন অলিভারকে নিয়ে গঞ্জে গিয়েও হ্যারী খোঁজ নিলো, কিন্তু সে লোক দুটোর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না!

এদিকে মিস্ রোজ্ তাড়াতাড়ি সেরে উঠলো। সমস্ত পরিবারে আবার আনন্দের জোয়ার বইলো, কিন্তু অলিভারের নজর এড়ালো না যে, মাঝে-মাঝে রোজ্ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে যায়। লুকিয়ে সে দেখেছে, রোজ্ প্রায়ই নিজের চোখের জল মোছে।

কয়েকদিন পরে সকালবেলায় হ্যারী জানালো যে, সে রোজ্‌কে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু রোজ এ প্রস্তাবে রাজী হলো না। সে বললোঃ "আমি সহায় সম্পদহীনা; তাছাড়া, আমার জীবনের ইতিহাস কলঙ্কে ভরা। আমি তোমাকে বিয়ে ক'রে তোমার উন্নতির পথে কাঁটা হ'তে পারি না। সত্য বটে, ওসব অপবাদ সত্ত্বেও আমি নির্দোষ, তবু আমি কাউকে সে-অপবাদের ভাগীদার করতে চাই না। যদি তোমার অবস্থা অন্যরকম হতো—যদি তোমার স্থান আমার চেয়ে এত উঁচুতে না হতো, তাহ'লে হয়তো তোমার প্রস্তাব মেনে নিতাম; কিন্তু এখন তোমাকে বিয়ে করলে লোকে ভাববে, তোমার সম্পদ আর খ্যাতির লোভে আমি তোমাকে বিয়ে করেছি।"

হ্যারী এর ওপর আর কোনো কথা বলতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত সে রোজের কাছ থেকে শুধু এই প্রতিশ্রুতি আদায় করলো যে, এক বছরের মধ্যে সে আবার বিয়ের প্রস্তাব পেশ করবে এবং রোজ্ এর মধ্যে যেন এ বিষয়ে ভালো করে আবার ভেবে দেখে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অনাথ-আশ্রমের বৈঠকখানার অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন মিস্টার বাম্‌ব্‌ল্। তাঁর চোখ দুটো উদাস ছলছল, মুখে বিষাদের কালো ছায়া। তিনি তাঁর পুরোনো জীবনের কথা ভাবছিলেন।

তাঁর পোশাকের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অনাথ-আশ্রমের তত্ত্বাবধায়কের চকচকে মেরজাই আর তাঁর গায়ে নেই। তিনি আজকাল আর তত্ত্বাবধায়ক নন—মিসেস্ কর্নিকে বিয়ে ক'রে আশ্রমের কর্তা হয়েছেন। অন্য লোক এখন তত্ত্বাবধায়কের কাজ করছেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মিঃ বাম্ব্‌ল্‌ বললেন : "কাল দু'মাস পুরো হবে। মনে হচ্ছে, একটা যুগ কেটে গেছে যেন! উঃ, নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি আমি মাত্র ছ-খানা চামচ, একজোড়া রূপোর বাটি, একটা দুধের গামলা, কিছু পুরোনো আসবাব আর কুড়িটা পাউণ্ডের জন্যে। বড়ো সস্তায় বিকিয়ে গেছি···ধুলোর মতো সস্তা!"

—"সস্তা!" পেছন থেকে একটা চড়া গলা ভেসে এলো : "যে-দামেই তোমাকে কেনা হয়ে থাক না কেন, সেটা-ই বেশী দেওয়া হয়েছে!"

ফিরে তাকিয়ে মিঃ বাম্ব্‌ল্‌ দেখলেন, তাঁর নতুন বিয়ে করা বউ দাঁড়িয়ে। মিঃ বাম্ব্‌ল্‌ তাঁর বরাবরের অভ্যাসমতো রুক্ষ মেজাজে বললেন : "কী ব্যাপার?"

মিঃ বাম্ব্‌লের যেরকম চাহনি দেখে অনাথ-আশ্রমের বাসিন্দারা ভয়ে কুঁকড়ে যেতো ঠিক সেই ধরনের হিংস্র চাহনি নিয়ে কটমটিয়ে তাকালেন তিনি নিজের স্ত্রীর দিকে। কিন্তু মিসেস্‌ বাম্ব্‌ল্‌ ওরফে কর্নি তাতে একটুও ভয় পেলেন না, বরং তুড়ি মেরে হেসে উঠলেন।

মিস্টার বাম্ব্‌ল্‌ মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে রইলেন।

মিসেস্‌ বাম্ব্‌ল্‌ জিজ্ঞাসা করলেন : "আজ কি সারা দিনটাই ওখানে ব'সে নাক ডাকাবে নাকি?"

মিস্টার বাম্ব্‌ল্‌ জবাব দিলেন : "আমার যা খুশী তাই করবো! নাক ডাকাবো···হাঁ ক'রে থাকবো··হাঁচবো কাঁদবো··আমার যা ইচ্ছে, আমি তাই করবো··সে অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে।"

আর এক পরদা গলা চড়িয়ে রুক্ষ মেজাজে মিসেস্‌ বাম্ব্‌ল্‌ বললেন : "তোমার অধিকার?"

—"হ্যাঁ, অধিকার! সব-কিছু করার একচেটিয়া অধিকার পুরুষদের আছে। মেয়েদের অধিকার শুধু পুরুষদের হুকুম তামিল করা।"

রাগে মিসেস্‌ বাম্ব্‌ল্‌ গর্জে উঠলেন : "তোমার মতো জানোয়ার ছাড়া এ-ধরনের কথা কেউ বলে না! তুমি তো মানুষ নও, একটা আস্ত গাধা!" তারপর মিসেস্‌ বাম্ব্‌ল্‌ অসহায় রাগে কেঁদে ফেললেন।

মিস্টার বাম্ব্‌ল্‌ তাতে কিন্তু একটুও ঘাবড়ে গেলেন না। ব্যঙ্গের সুরে তিনি বললেন : "হ্যাঁ, খুব ক'রে কাঁদো। চোখের জলে ধুলে মুখের ময়লা কেটে যায় চোখের ব্যায়াম হয়···মেজাজ ঠাণ্ডা হয়···বুঝলে? আচ্ছা ক'রে কেঁদে নাও।" একথা বলে বেশ চালের সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি ট্রাউজারের দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়ালেন।

মিঃ বাম্ব্‌ল্ মাত্র ঘরের দরজা অবধি গেছেন, এমন সময় তাঁর মাথা থেকে বোঁ ক'রে টুপিটা উড়ে গেল! তাঁর স্ত্রী তাঁকে জাপটে ধ'রে বেশ গোটাকয়েক কিল বসিয়ে দিলেন। তারপর স্বামীকে ঘরের মধ্যে টেনে এনে চেয়ারে জোর ক'রে বসিয়ে ক্ষেপা কুকুরের মতো হাতের নখ দিয়ে চোখ-মুখ আঁচড়াতে লাগলেন। শেষে মুঠো ক'রে মাথার চুল টেনে ধ'রে বললেন: "ওঠো শীগগির। এখনি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। নইলে তোমার কপালে এর চেয়েও ঢের বেশী দুর্ভোগ আছে।"

মিঃ বাম্ব্‌ল্ ভয়ে-ভয়ে তাঁর টুপিটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে স'রে পড়লেন।

বেরুবার সময় মিঃ বাম্ব্‌লের নজরে পড়লো, বাইরে একটা ঘরের ভেতর কতকগুলো অনাথা মেয়ে গোলমাল করছে। কর্তৃত্বের অভিমানে ঘরে ঢুকে ধমক দিয়ে উঠলেন: "কি হচ্ছে? এত হল্লা করছিস্ কেন?"

এমন সময় মিসেস্ বাম্ব্‌ল্ সেখানে ছুটে এসে স্বামীকে দেখেই গর্জে উঠলেন: "এখনো দূর হওনি এখান থেকে?"

ভিজে বেড়ালের মতো মিঃ বাম্ব্‌ল্ বললেন: "এরা যে গোলমাল করছিলো!"

"গোলমাল করছিলো তো তোমার কি?" ভেংচে উঠলেন মিসেস্ বাম্ব্‌ল্: "এরা চেঁচাক, হৈ-হট্টগোল করুক, তাতে তোমার কি? খবরদার! এদের ব্যাপারে কখনো নাক গলাতে এসো না। যাও, এখান থেকে দূর হও শীগ্‌গির!"

মুখ কাঁচু-মাচু করে মিঃ বাম্ব্‌ল্ বেরিয়ে গেলেন অনাথ-আশ্রম থেকে।

সদর দরজা দিয়ে বেরুবার সময়ে, রাগ দেখাবার জন্যে দ্বাররক্ষী অনাথ-বালকটার কানে একটা ঘুষি বসিয়ে দিলেন। তারপর পথে-পথে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে মনের জ্বালার কিছুটা উপশম করলেন। এমন সময়ে ঝমঝম ক'রে নামলো বৃষ্টি। তখন একটা মদের দোকানে ঢুকে এক গেলাস মদ দেবার হুকুম দিয়ে বসলেন তিনি।

দোকানে তখন আর একজন মাত্র লোক ছিল। লোকটা লম্বা, গায়ের রং ময়লা, মস্ত একটা কোট তার পরনে। মিঃ বাম্ব্‌লের সঙ্গে তার চোরা-চাহনির বিনিময় হলো কয়েকবার, কিন্তু দু'জনেই চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে লোকটা বললো: "মনে হচ্ছে যেন আগে কোথাও দেখেছি আপনাকে, তখন কিন্তু আপনার বেশভূষা ছিলো অন্যরকম।"

মিঃ বাম্ব্‌ল্ বললেন : "হ্যাঁ। আমি তখন অনাথ-আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম। এখন আমি আশ্রমের কর্তা।"

লোকটা বললো : "তা, উঁচু পদে উঠলেও আপনার টাকার খাঁকতি কমেনি নিশ্চয়ই ?"

মিঃ বাম্ব্‌ল্ বললেন : "তা, অনাথ-আশ্রমের কর্মীদের মাইনে তো এমন কিছু বেশী নয়। ভদ্রভাবে উপরি-আয় কিছু হ'লে তারা কি তা ছাড়তে পারে ?"

লোকটা তখন দোকানদারকে ডেকে আরও দু-গেলাস মদ দেবার হুকুম দিয়ে মিঃ বাম্ব্‌ল্‌কে বললো : "শুনুন তবে। আপনার খোঁজেই আমি আজ এসেছি এ-শহরে! তা, ভাগ্যক্রমে সহজেই দেখা হয়ে গেল আপনার সঙ্গে। আপনার কাছে কিছু খবর জানতে চাই, অবশ্য বিনি পয়সায় নয়। এর প্রমাণ হিসেবে এই নিন সামান্য কিছু আগাম—রাখুন এটা!" এই ব'লে সে দুটো গিনি গুঁজে দিলো মিঃ বাম্ব্‌লের হাতে।

মিঃ বাম্ব্‌ল্ গিনি দুটো ভালো ক'রে দেখে নিয়ে পকেটে পুরলেন। লোকটা বলতে লাগলো : "এবারে কাজের কথায় আসা যাক্। আপনাকে একটু কষ্ট ক'রে ভাবতে হবে বছর-বারো আগের কথা। শীতকাল স্থান অনাথশালা···সময় রাত। একটা ছেলে জন্ম দিয়ে মারা গেলো এক অনাথা তরুণী!"

বাধা দিয়ে মিঃ বাম্ব্‌ল্ বললেন : "একটা কেন, এরকম ঘটনা তো আগে অনেক ঘটতে দেখেছি।"

লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো : "গোল্লায় যাক্ আপনার অনেক ঘটনা। আমি একটা ঘটনার কথাই বলছি। যে-ছোঁড়াটা কিছুদিন কফিনওয়ালার কাছে কাজ করেছিলো, আমি সেই ছোঁড়াটার কথাই বলছি। ছোঁড়াটা যে কেন নিজের কফিনও ওই সাথে তৈরি ক'রে তার মধ্যে চিরদিনের মতো শুয়ে পড়লো না, সেকথাই বার বার ভাবি।"

—"ও, আপনি কি তাহ'লে অলিভারের কথা বলছেন ? অলিভার টুইস্ট ? সেই লক্ষীছাড়া ছোঁড়াটার কথা বোধহয় জানতে চান ?"

—"না, অলিভারের বিষয়ে কোনো কথা শুনতে চাই না—অনেক শুনেছি তার বিষয়ে। আমি জানতে চাই সেই বুড়ীর কথা, যে অলিভারের মায়ের দাইয়ের কাজ করেছিলো।"

"সে-বুড়ী গত-বছর শীতকালে মারা গেছে।" মিঃ বাম্ব্‌ল্ বললেন। এ-কথা শুনে লোকটা কি যেন খানিকক্ষণ ভাবতে লাগলো, তারপর

"যাক্-গে" ব'লে উঠে পড়লো। মিঃ বাম্ব্‌লের মনে হলো, তাঁর স্ত্রীর কাছে এমন-কিছু গোপন খবর থাকতে পারে, যা হয়তো এ লোকটাকে দিতে পারলে কিছু টাকা রোজগার করা যাবে। কেননা, স্যালী-বুড়ী মারা যাবার আগে তাঁর স্ত্রীকে ডেকে গোপনে কি সব বলে গিয়েছিলো। সেসব মনে করে তিনি লোকটাকে বললেন : "সেই বুড়ী মরার কিছু আগে অপর-এক মেয়েছেলেকে গোপনে কিসব যেন বলেছিলো—খুব সম্ভব তা থেকে আপনার কিছুটা কাজ হতে পারে।"

এ-কথায় লোকটার মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো। সে জিজ্ঞাসা করলো : "কেমন ক'রে আমি সেই মেয়েছেলের দেখা পেতে পারি।"

মিঃ বাম্ব্‌ল্ বললেন : "সে ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি, মশাই। অবশ্য আপনি যদি আগামীকাল পর্যন্ত সময় দেন আমাকে!"

—"তাহলে কাল ঠিক রাত ন'টার সময় এই ঠিকানায় সেই মেয়েছেলেকে নিয়ে আসবেন গোপনে।" এই ব'লে সে এক টুকরো কাগজে একটা ঠিকানা লিখে বাম্ব্‌ল্‌কে দিলো। তারপর মদের দাম মিটিয়ে দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা।

মিঃ বাম্ব্‌ল্ কাগজের টুকরোটা প'ড়ে দেখলেন যে, তাতে কোনো নাম লেখা নেই। তিনি তাড়াতাড়ি লোকটার পিছু ধাওয়া করে কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকতেই লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো : "কি হলো আবার? পেছু-ধাওয়া করলেন কেন?"

কাগজখানা দেখিয়ে মিঃ বাম্ব্‌ল্ বললেন : "কার নাম ধ'রে ডাকবো আমি?"

—"মঙ্ক্‌স্।"

* * *

গরমের গুমোট-ভরা রাত। ঘন মেঘে-ঢাকা আকাশ। এর মাঝে এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গেছে—ঝড়ের সঙ্কেতও মাঝে মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এমন সময় মিস্টার ও মিসেস্ বাম্ব্‌ল্ এক বস্তিতে একটা পুরোনো ভাঙা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাড়িটার পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে।

—"কে ওখানে?... দাঁড়াও এক মিনিট!"

দোতলা থেকে ঝুঁকে প'ড়ে একটা লোক বাম্ব্‌ল্-দম্পতিকে দেখে ওই কথা বললো।

একটু পরেই লোকটা নেমে এসে দরজা খুলে দিয়ে বললো ঃ "ভেতরে এসো !"

মিসেস্ বাম্ব্‌ল্ প্রথমে একটু ইতস্ততঃ ক'রে তারপর সাহসের সঙ্গে ঢুকে পড়লেন। লজ্জায় হোক্ বা ভয়ে হোক্, মিস্টার বাম্ব্‌ল্ও স্ত্রীর পেছন পেছন চললেন।

মঙ্ক্‌স্ বললো ঃ "ভূতের মতো ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন তোমরা ?"

"আমরা ?...আমরা এই একটু ঠাণ্ডা হচ্ছিলাম।"—ধরা গলায় জবাব দিলেন মিঃ বাম্ব্‌ল্।

"ঠাণ্ডা হচ্ছিলে ?"—ঝাঁজিয়ে উঠলো মঙ্ক্‌স্ঃ "মানুষের মনে যে নরকের আগুন জ্বলছে, তা ঠাণ্ডা করার মতো বৃষ্টি কোনোদিন পড়েনি, পড়বেও না! যাক, এ সেই মেয়েছেলে নাকি ?"

"হ্যাঁ।"—জবাব দিলেন মিঃ বাম্ব্‌ল্।

তারপর তিনজনে মই বেয়ে দোতলার ঘরে উঠলেন। ঘরে ঢুকে সমস্ত জানালা বন্ধ ক'রে দিয়ে লণ্ঠনের শিখাটা কমিয়ে দিলো মঙ্ক্‌স্। তারপর একটা পুরোনো টেবিলের চারপাশে তিনখানা চেয়ারে বসলো তারা।

কথায়-কথায় মঙ্ক্‌স্ জেনে ফেললো যে, আগন্তুক মেয়েছেলে মিস্টার বাম্ব্‌লেরই স্ত্রী। সে আর সময় নষ্ট না ক'রে মিসেস্ বাম্ব্‌ল্কে জিজ্ঞাসা করলো ঃ "সেই বুড়ীর মরণের সময় তুমি নাকি তার কাছে ছিলে! সে তোমাকে কি বলেছিলো ?"

মিসেস্ বাম্ব্‌ল্ বললেন ঃ "হ্যাঁ, তুমি এঁর কাছে যে-ছেলেটার নাম করেছো, তার মায়ের সম্বন্ধে সে আমাকে কিছু বলেছিলো।"

মঙ্ক্‌স্ বললো ঃ "তাহ'লে প্রথম প্রশ্ন হলো, কি-বিষয়ে সে তোমাকে বলেছিলো ?"

মিসেস্ বাম্ব্‌ল্ বললেন ঃ "ওটা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্ন হলো, এ-খবরটা তোমাকে দিলে তার দক্ষিণা কতো পাবো ?"

"সে শুধু শয়তানই জানে!"—বললো মঙ্ক্‌স্।

মিসেস্ বাম্ব্‌ল্ বললেন ঃ "তাহ'লে তো তোমারই তা জানা উচিত!"

মিসেস্ বাম্ব্‌লের এই নির্ভীক জবাবে মঙ্ক্‌স্ অবাক্ হয়ে গেল।

মঙ্ক্‌স্ বুঝলো যে, ভারী শক্ত মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়েছে সে ; বেশ কিছু লোভ না দেখালে আসল খবরটা বের করা যাবে না। তাই খবরটার বিনিময়ে সে কুড়ি পাউণ্ড দিতে কবুল করলো। মিসেস্ বাম্ব্‌ল্ অতো অল্প দামে খবরটা বেচতে রাজী হলেন না। শেষে দর কষাকষি

ক'রে দামটাকে পঁচিশ পাউণ্ডে তুললেন! অগত্যা টাকাটা গুনে টেবিলের ওপর রেখে মঙ্ক্‌স্ বললোঃ "নাও, টাকাটা তুলে রাখো। এবার খবরটা বলো।"

মিসেস্ বাম্ব্‌ল্ বলতে শুরু করলেনঃ "সেই বুড়ী দাই যখন মারা যায়, তখন ঘরে আমিই শুধু ছিলাম তার কাছে· আর কেউ না। মরার সময় সে একটা তরুণীর কথা বলেছিলো, যে নাকি কয়েক-বছর আগে ঠিক ওই ঘরেই এবং ওই বিছানাতেই শুয়ে একটা সন্তান প্রসব করে মারা যায়। মরার সময়ে সেই তরুণী ওই বুড়ীকে একটা জিনিস দিয়ে যায় এবং তার সন্তানের মুখ চেয়ে সেটাকে রক্ষা করতে বলে। বুড়ী অবশ্য পরে জিনিসটা বেচে দেয়।"

"বেচে দিয়েছে?"—চেঁচিয়ে উঠলো মঙ্ক্‌স্ঃ "কোথায়? কবে? কার কাছে?"

মিসেস্ বাম্ব্‌ল্ বললেনঃ "এটুকু আমাকে বলেই সেই বুড়ী মারা যায়।"

"মিছে কথা!"—গরজে উঠলো মঙ্ক্‌স্ঃ "আমার সঙ্গে চালাকি খাটবে না। নিশ্চয়ই সে আরও কিছু বলেছে। সব কথা আমাকে খুলে বলো, নইলে জেনে রেখো, যেভাবে এখানে ঢুকেছো, সেভাবে এখান থেকে বেরুতে পারবে না!"

মঙ্ক্‌সের কথা শুনে মিঃ বাম্ব্‌ল্ ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন, কিন্তু মিসেস্ বাম্ব্‌ল্ কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে বেশ ঠাণ্ডা মাথায় বললেনঃ "যা বললাম তার চেয়ে বেশী একটা কথাও সেই বুড়ী আর বলেনি। তবে সে হাত দিয়ে আমার পোশাক চেপে ধরেছিলো। সে মারা গেলে, আমি জোর ক'রে তার হাত ছাড়াবার সময়ে একখানা কাগজ পাই—সেখানা বন্ধকীর রসিদ। বুড়ী অনেক দিন ধ'রে রেখেছিলো জিনিসটাকে, আসল মালিকের কাছে পৌঁছে দিয়ে একটা মোটা দাঁও মারার মতলবে। কিন্তু অনেক অপেক্ষা করার পরেও কেউ যখন এলো না, আর বুড়ীরও যখন অর্থের অভাব ঘটলো, তখন সে জিনিসটা বাঁধা দেয় এবং বছরের পর বছর নিয়মিত-ভাবে সুদ দিতে থাকে। আমি রসিদখানা পেয়ে জিনিসটাকে ছাড়িয়ে এনে নিজের কাছে রেখে দিয়েছি, কি জানি কখন কি কাজে লাগে!"

"কোথায় সে-জিনিসটা!"—ব্যগ্র-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো মঙ্ক্‌স্।

"এই যে!"—ব'লে মিসেস্ বাম্ব্‌ল একটা ছোট ব্যাগ বের ক'রে দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হলেন। মঙ্ক্‌স্ সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে খুলে ফেলে দেখলো ব্যাগের মধ্যে একটা ছোট্ট সোনার লকেট···লকেটের মধ্যে দু' গোছা চুল

আর একটা সাধারণ বিয়ের আংটি ··আংটিতে 'য়্যাগ্‌নেস্' নাম-লেখা··· কোনো পদবী নেই, আর আছে অলিভারের জন্মের কয়েক বছর আগেকার একটা তারিখ।

মিসেস্ বাম্ব্‌ল্ মঙ্ক্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন: "এটা নিয়ে তুমি কি করবে? এ-দিয়ে আমার ক্ষতি করবে না তো?"

"কখনোই না। এই দেখ না, কি করি। সাবধান! এক পাও এগিয়ো না, তাহ'লে তোমাদের জীবনের দাম একটা কাণা কড়িও থাকবে না"—এই ব'লে মঙ্ক্‌স্ হঠাৎ টেবিলটা সরিয়ে ফেলে মেঝের একটা আঙ্‌টা ধ'রে টান দিতেই মিঃ বাম্ব্‌লের পায়ের কাছ থেকে একটা চোরা-দরজা বেরিয়ে পড়লো।

মিস্টার বাম্ব্‌ল্ আঁৎকে উঠে কয়েক পা পেছিয়ে গেলেন।

তারপর মঙ্ক্‌সের কথামতো তাঁরা সেই চোরা-দরজার নীচে তাকিয়ে দেখলেন, সেখান দিয়ে একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। মঙ্ক্‌স্ বললো: "আমি ইচ্ছে করলে তোমাদের ওই নদীতে ডুবিয়ে মারতে পারতাম।"

মিস্টার বাম্ব্‌ল্ বললেন: "উঃ, কি স্রোত! ওখানে আজ কেউ পড়লে কাল সকালে তার লাশ বারো মাইল দূরে গিয়ে ভেসে উঠবে।"

মঙ্ক্‌স্ তখন মিসেস্ বাম্ব্‌লের কাছ থেকে পাওয়া ব্যাগটার সাথে একটা লোহার ভারী জিনিস বেঁধে, সেটাকে নদীর মধ্যে ছুড়ে ফেলে চোরা-দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলো। তারপর সে মিস্টার বাম্ব্‌ল্‌কে বললো: "তোমার স্ত্রীকে আমার ভয় নেই, কিন্তু তুমি এরপর মুখ বুঁজে থেকো, বুঝলে? নাও, এখন তোমরা বিদায় হও!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সাইক্‌স্ আগে যে বাসায় থাকতো, এখন আর সেখানে থাকে না। এখন একটা নোংরা গলির ভেতর অপরিষ্কার একটা ঘরে আস্তানা নিয়েছে। সেখানে আসবাবপত্র তেমন নেই। ঘরের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, লোকটার আর্থিক অবস্থা রীতিমতো খারাপ হয়ে পড়েছে আজকাল।

তালি দেওয়া পোশাকে সাইক্‌স্ অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলো। মুখে একরাশ দাড়ি—হপ্তাখানেক কামানো হয়নি। কুকুরটা বিছানার কাছে শুয়ে প্রভুর দিকে পিট্‌পিট্ ক'রে তাকাচ্ছিলো, কখনও-বা চাপা

গলায় গজরাচ্ছিলো। জানালার ধারে ব'সে একমনে সাইক্‌সের একটা ছেঁড়া জামায় তালি দিচ্ছিলো ন্যান্‌সি। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দিন-রাত একনাগাড়ে সাইক্‌স্‌কে সেবা করার ফলে তাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো। এখন আর তার আগের মতো চেহারার জৌলুষ নেই—বেশ রোগা হয়ে গেছে সে।

হঠাৎ সাইক্‌স্ জিজ্ঞাসা করলো: "কটা বাজে?"

ন্যান্‌সি জবাব দিলো: "সাতটা বেজে গেছে। কেমন আছো আজ বিল্‌?"

—"বিলকুল কাদার মতো বনে গেছি ন্যান্‌সি! হাতটা ধরো তো দেখি, এ হতচ্ছাড়া বিছানাটাকে ছেড়ে একবার উঠি!"

রোগে পড়েও সাইক্‌সের মেজাজ কিন্তু ঠাণ্ডা হয়নি। উঠতে-উঠতে সে এমন সব বিচ্ছিরি গালাগালি দিতে লাগলো ন্যান্‌সিকে, যা শুনে বেচারা ন্যান্‌সি বেহুঁশ হয়ে পড়লো।

এমন সময়ে ঘরে ঢুকে ফ্যাগিন্ বললো: "একি ব্যাপার ভায়া?"

সাইক্‌স্ রেগে উঠলো: "ওখানে দাঁড়িয়ে অমন ক'রে চোখ পাকিয়ে দেখছো কি? পারো তো ওকে একটু সাহায্য কর· দেখছো না, ন্যান্‌সি মুচ্ছো গেছে!"

ফ্যাগিনের পেছনে-পেছনে ধুরন্ধর ও চার্লি এসেছিলো। ধুরন্ধরের বগলে ছিলো একটা মোড়ক। সে সেটাকে মাটির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চার্লির হাত থেকে একটা বোতল ছিনিয়ে নিলো! তারপর বোতলের মদটা নিজে একটু চেখে দেখে ন্যান্‌সির মুখে ঢেলে দিতে দিতে বললো: "চার্লি, পাখা দিয়ে খুব জোরে জোরে বাতাস করো। ফ্যাগিন্, তুমি ওর হাতে আস্তে আস্তে থাব্‌ড়াতে থাকো! আর সাইক্‌স্, তুমি ততক্ষণ জামা-কাপড়গুলো একটু আল্‌গা ক'রে দাও।"

ধুরন্ধরের কথামতো সবাই চট্‌পট্ সেবা শুরু করায় ন্যান্‌সি শীগ্‌গির চাঙ্গা হয়ে উঠলো। ফ্যাগিন্ বললো: "বিল্‌, তোমার জন্যে কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে এসেছি।"

সাইক্‌স্ বললো: "বেশ করেছো, কিন্তু আজ রাতে যে কিছু চাঁদি চাই!"

ফ্যাগিন্ বললো: "আমার কাছে এখন একটাও পয়সা নেই।"

—"তোমার বাড়িতে ঢের আছে।"

—"ঢের?

—"হ্যাঁ, ঢের। কত আছে তা জানি নে, তুমিও বেশ ভালো করে না গুণে ঠিক তা বলতে পারবে না মোদ্দা, আজ রাত্তিরে কিছু টাকা আমার চাই-ই।"

—"বেশ, আমি ধুরন্ধরকে দিয়ে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।" ব'লে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো ফ্যাগিন্।

সাইক্‌স্ বললোঃ "উঁহু! ধুরন্ধর হচ্ছে বহুৎ ধুরন্ধর! ও হয় এখানে আসতে ভুলে যাবে, নয়তো পথ হারিয়ে ফেলবে, নয়তো বা লাল পাগড়ীর ফাঁদে পড়বে। আসলে এখানে না আসার একটা কিছু সাফাই কৈফিয়ৎ ও বানিয়ে নিতে পারবে। সে হবে না—ন্যান্‌সি যাক্ তোমার গরুর গোয়ালে টাকা নিয়ে আসতে।"

অগত্যা ফ্যাগিন্ তার দলবল আর ন্যান্‌সিকে নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হলো।

তারপর ফ্যাগিনের ঘরে 'ওরা যখন পৌঁছোলো, তখন সেখানে টোবি ক্র্যাকিট আর টম্ চিট্‌লিং ব'সে তাসের জুয়া খেলছিলো। ওরা পৌঁছোতেই সবাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো—রইলো কেবল ফ্যাগিন্ আর ন্যান্‌সি। ফ্যাগিন্ টাকার বাক্স খুলতে যাবে, এমন সময়ে নীচে পায়ের শব্দ শুনে চম্‌কে উঠলো···কে একজন ঘরের দিকে আসছে! তার গলার স্বর শুনে ফ্যাগিন্ চিনতে পারে আগন্তুককে, আর ন্যান্‌সি চম্‌কে ওঠে।

ফ্যাগিন্ তাড়াতাড়ি বলে ওঠেঃ "বাঃ! এ লোকটারই তো এখানে আসার কথা ছিল না! যাক্, এসে গেছে ভালোই হলো। ন্যান্‌সি! ওর সামনে টাকার কথা তুলো না। দশ মিনিটের মধ্যেই ও চলে যাবে।"

ঘরে ঢুকলো মঙ্ক্‌স্।

ন্যান্‌সিকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে যাবার তোড়জোড় করতেই ফ্যাগিন্ বলে উঠলোঃ "আরে না-না, একে দেখে তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই হে! এ আমারই চেলাদের একজন।"

ন্যান্‌সি কিন্তু তখন মঙ্ক্‌সের দিকে একনজরে তাকিয়ে আছে।

ফ্যাগিন্ জিজ্ঞাসা করেঃ "কোনো খবর আছে কি?"

মঙ্ক্‌স্ জবাব দেয়ঃ "খুব দামী খবর আছে হে!"

ফ্যাগিন্ জিজ্ঞাসা করেঃ "ভালো কি খারাপ?"

মঙ্ক্‌স্ বলেঃ "অন্তত মন্দ নয়। তোমার সঙ্গে কিছু গোপন কথা আছে।" এই বলে মঙ্ক্‌স্ ন্যান্‌সির দিকে তাকালো। ন্যান্‌সি কিন্তু ঘর ছেড়ে চলে যাবার কোনো আগ্রহ দেখালো না।

একটা মদের বোতল তুলে নিয়ে ধুরন্ধরের প্রতি লক্ষ্য করলো...

ন্যান্সিকে চলে যেতে বললে পাছে সে চেঁচিয়ে টাকা চেয়ে বসে, এই ভয়ে ফ্যাগিন্ মঙ্ক্স্কে নিয়ে ওপর-তলায় গেলো গোপন আলোচনার জন্যে। ওরা দু'জন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ন্যান্সি নিজের জুতো খুলে ফেললো ও কালো গাউনটায় তার সারা দেহ মুড়ি দিয়ে নিলো। তারপর খালি পায়ে চুপিচুপি পা টিপে-টিপে সিঁড়ি বেয়ে সে ওপরে উঠে গেলো মঙ্ক্স্ ও ফ্যাগিনের গোপন কথাবার্তা শোনার জন্যে।

মিনিট পনেরো পরে ন্যান্সি ফিরে এলো। ফ্যাগিন্ ফিরে এসে দেখে ন্যান্সি বিবর্ণ মুখে ঘরে বসে আছে। সে বলে ওঠে: "ন্যান্সি! মুখটা তোর ভয়ে আম্সী হয়ে গেছে কেন?"

ন্যান্সি বলে: "আমি তার কি জানি! এই ঘুপসি ঘরে কতক্ষণ অপেক্ষা করবো! টাকা দাও, চলে যাই।" আর দেরী না করে ফ্যাগিন্ ন্যান্সির হাতে গুণে-গুণে টাকা দিলো আর প্রতিটি টাকা দেওয়ার সাথে-সাথে সে একটা ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

উত্তেজিত অবস্থায় ন্যান্সি টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরলো। তার ভাগ্য ভালো যে, সাইক্স্ তার পরদিন সেই-টাকা নিয়ে মনের সুখে মদ খেতে লাগলো—ন্যান্সির আচরণে কোনো পরিবর্তন নজর করার মতো মনের অবস্থা আর তার রইলো না।

বেলা প'ড়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই ন্যান্সির মানসিক উত্তেজনা খুব বেড়ে গেলো। সে অপেক্ষা করতে লাগলো, সাইক্স্ কখন মদ খেতে-খেতে ঘুমিয়ে পড়বে। ন্যান্সির মুখে এমন একটা বিবর্ণ ভাব আর তার চোখে এমন একটা জ্বালা ফুটে উঠলো যে, সাইক্সেরও তা নজরে পড়লো, কিন্তু ন্যান্সিকে জিজ্ঞেস ক'রে এর কোনো সদুত্তর পেলো না সে।

তারপর সাইক্স্ নিঝুম হয়ে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকার পর ন্যান্সিকে হাত-পা টিপে দেবার জন্যে হুকুম করলো। এরপর এক নজরে ন্যান্সির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সাইক্স্ যেন মনে মনে বললো: "নাঃ, এমন বিশ্বাসী মেয়ে আর একটাও নেই, নইলে তিন মাস আগেই ওর গলা কেটে ফেলতাম!"

সাইক্স্ ঘুমোচ্ছে না দেখে ন্যান্সি এবার মদের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে তাকে কয়েক পাত্র মদ খেতে দিতেই সাইক্স্ শীগ্গির ঘুমিয়ে পড়লো। ন্যান্সি তখন তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পোশাক বদলে চুপিচুপি ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো।

রাত তখন সাড়ে নটা। রাস্তায় নেমে এত হন্ হন্ করে সে হাঁটতে

লাগলো যে, পথিকেরা পর্যন্ত অবাক্ হয়ে গেলো। হাঁটতে-হাঁটতে ন্যান্সি দেখলো রাস্তার দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে যতটা পারে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগোতে লাগলো হাইড্ পার্কের দিকে। ঘড়িতে এগারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সে একটা হোটেলের সামনে এসে এদিক্ ওদিক্ চেয়ে কয়েকবার পায়চারী করে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়লো। কিন্তু একটু ঢুকেই দারোয়ানের আসন খালি দেখে সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

ঠিক সেই সময়ে এক তরুণী পরিচারিকা তাকে জিজ্ঞাসা করলো: "কি চাই?" তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে অবজ্ঞার ভাব।

ন্যান্সি বললো: "মিস্ মেইলীকে চাই!"

পরিচারিকার ডাকে একটা চাকর বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো: "কি নাম তোমার? কি দরকার তাঁকে?"

ন্যান্সি তা জানাতে অস্বীকার করলো। চাকরটা তখন তাকে সদর দরজার দিকে ঠেলে আঙুল দেখিয়ে বললো: "তবে—ভাগো হিঁয়াসে!"

ন্যান্সি বললো: "তা যদি বলো তো, তোমরা দু'জনে মিলেও আমাকে এখান থেকে বের ক'রে দিতে পারবে না।"

এমন সময়ে এক ঠাণ্ডা মেজাজের পাচক এসে বললো: "আঃ! কি ঝামেলাই না তোমরা বাঁধিয়ে তুললে এতো রাতে! ওহে জো! খবরটা দাওনা ছাই তেনার কাছে পৌঁছে। তাহলে তো হাঙ্গামা চুকে যায়।"

অগত্যা মিস্ মেইলীকে খবর দিতে গেল জো, আর বিবর্ণমুখে রুদ্ধশ্বাসে তার আসার অপেক্ষা করতে লাগলো ন্যান্সি। সেই সময় ন্যান্সি পরিষ্কার শুনতে পেলো, হোটেলের পরিচারিকারা তাকে লক্ষ্য করে কুৎসিত ভাবে গালাগালি দিচ্ছে। ন্যান্সি নীরবে সহ্য করে রইলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জো ফিরে এসে ন্যান্সিকে নিয়ে দোতলার একটা ছোট কুঠরিতে বসালো।

রোজ্ ঘরে ঢুকতে ন্যান্সি প্রথমে একটু চড়া মেজাজে ব'লে উঠলো: "আপনার সঙ্গে দেখা করা ভারী শক্ত ব্যাপার। আমি যদি আর-দশজনের মতো রাগ করে চলে যেতাম, তাহলে হয়তো আপনাকে অনুতাপ করতে হতো সে-জন্যে।"

রোজ্ বললো: "কেউ যদি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার ক'রে থাকে ভাই, তার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত! আমার অনুরোধ, তুমি

সেসব কথা মন থেকে মুছে ফেল। এখন বলো, কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো।"

রোজের ঠাণ্ডা মেজাজ ও তার মিষ্টি কথাবার্তা শুনে অবাক হয়ে ন্যান্সি প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বললোঃ "আমার আসল পরিচয় না জেনে এমন সদয়ভাবে কথা বলবেন না আমার সঙ্গে। যাক্, রাত বেড়ে যাচ্ছে, কাজের কথাটাই বলে ফেলি আগে—ওই দরজাটা বন্ধ আছে তো?"

ভয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে রোজ্ জানালোঃ "হ্যাঁ আছে। কিন্তু কেন বলো তো?"

ন্যান্সি বললোঃ "কেননা আমি কয়েকজনের জীবন আপনার হাতে সঁপে দিচ্ছি।" বলার সাথে সাথে ন্যান্সি ভীষণ মুষড়ে পড়লো।

কিভাবে নিজের মনের উদ্বেগের কথাটা পাড়বে, তা ঠিক করতে না পেরে রোজের মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ন্যান্সি মাথা নীচু করে বললোঃ "আমিই পেণ্টনভিলের বাড়ি থেকে অলিভারকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিলাম ফ্যাগিনের আড্ডায়।"

—"তুমি!"

—"হ্যাঁ, আমিই। আমি সেই মহাপাপিনী, যে চোরেদের দলে বাস করে এবং যে জ্ঞান হবার পর থেকে ভালো পরিবেশে বাস করার কোনো সুযোগই পায়নি।"

বিস্ময়-ভরা চোখে রোজ্ সেই বিচিত্র নারীমূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলো। বেদনায় ভরে এলো তার মন। শান্ত গলায় সে বললোঃ "ভারী দুঃখ হয় তোমার জন্যে!"

—"আপনি করুণাময়ী! ভগবান আপনাকে সুখে রাখুন! আমি পালিয়ে এসেছি আপনাকে খবরটা দিতে···ওরা জানতে পারলে নিশ্চয়ই আমাকে খুন করবে। আচ্ছা, আপনি মঙ্ক্স্ নামে কোনো লোককে চেনেন কি?"

—"না তো!"

—"সে কিন্তু আপনাকে চেনে, আর আপনি যে এখানে আছেন তাও তো সে জানে। আমি তার কথাবার্তা লুকিয়ে শুনেছি বলেই আপনার ঠিকানা পেয়ে এখানে আসতে পেরেছি।"

রোজ্ বললোঃ "আমি ও-নাম কখনো শুনিনি।"

—"তাহ'লে সে ছদ্মনামে আমাদের দলে মেশে। আমিও তাই ভেবেছিলাম। অলিভারকে আপনাদের বাড়িতে ডাকাতির কাজে লাগিয়ে

দেবার ক'দিন পরেই ওই লোকটা হঠাৎ ফ্যাগিনের সঙ্গে দেখা করে। ফ্যাগিন্ ওকে নিয়ে দোতলায় চলে যায় গোপনে কথা কইতে দরজা বন্ধ করে। আমার কেমন যেন লোকটাকে সন্দেহ হলো। তাই আমিও দোতলায় উঠে দরজার পাশে অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে ফ্যাগিনের সঙ্গে ওই লোকটার গোপন পরামর্শ শুনি···তাতে জানতে পারি—অলিভার যেদিন পুলিসে ধরা পড়ে, মঙ্ক্‌স্ সেদিন হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়েই বুঝতে পারে যে, এতদিন যে ছেলেটার সে খোঁজ করছিলো অলিভারই হচ্ছে আসলে সেই ছেলেটাই। তখন সে ফ্যাগিনের সঙ্গে ফন্দি আঁটে যে, ফ্যাগিন্ যদি অলিভারকে আটকে রেখে চোর বানাতে পারে, তবে সে মঙ্ক্‌সের কাছ থেকে মোটা টাকা পাবে।"

—"কিন্তু কি উদ্দেশ্য ওর ?"

—"সেটা তখন জানতে পারিনি। কেননা, মঙ্ক্‌স্ জানালা দিয়ে আমার ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে এবং ধরা পড়ার ভয়ে আমি তাদের আর কোনো কথা না শুনেই তাড়াহুড়ো করে পালিয়ে নীচে নেমে আসি।"

—"তারপর ?"

—"তারপর ওর দেখা পেলাম আবার কাল রাত্তিরে ফ্যাগিনের আস্তানায়। এসেই সে আগের মতো গোপনে পরামর্শ করবার জন্যে ফ্যাগিন্‌কে নিয়ে দোতলার ঘরে চলে গেল। আমিও এবার সারা দেহ এমনভাবে মুড়ে নিয়েছিলাম, যাতে সে আমার ছায়া দেখতে না পায়। দরজার পাশে লুকিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনলাম। মঙ্ক্‌স্ বললো ফ্যাগিন্‌কে, 'ছোঁড়াটার পরিচয়ের একমাত্র চিহ্ন এখন নদীর তলায়, আর যে-বুড়ীটা ওর মায়ের কাছ থেকে সেটা নিয়েছিলো, সে-বুড়ীও আজ কবরে শুয়ে।' মঙ্ক্‌স্ আরও বললো যে, যদিও সে ওই শয়তান ছেলেটার টাকা হাতিয়ে নিয়ে নিরাপদে ভোগ করছে, তবুও সে অন্যভাবে নিশ্চিন্ত হতে চায়, কেননা ওই ছেলেটাকে জেলে-জেলে ঘানি টানিয়ে, এবং পরিণামে ফ্যাগিনের সাহায্যে ফাঁসির দড়ি তার গলায় ঝুলিয়ে বাপের উইলের শর্ত ভেঙে চুরমার করতে পারলে কী সুবিধে না হবে! অবশ্য বিপদের সম্ভাবনা না থাকলে সে নিজেই ছেলেটার ঘাড় মট্‌কাতো কিন্তু তা যখন সে পারছে না, তখন ছেলেটার জীবনের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ বিষময় করে তোলার দিকে সে নজর দেবে, আর ছেলেটার জন্ম ও তার মায়ের কলঙ্কজনক ইতিহাসের সুযোগ নিয়েও সে তার ক্ষতি করবে। সবশেষে সে

বললো, 'ফ্যাগিন্, আমার ভায়ের জন্যে এমন ফাঁদ পাতবো যে, তোমারও তাক্ লেগে যাবে'।"

রোজ্ সবিস্ময়ে বললো: "ভাই!"

ন্যান্সি বললো: "হাঁ, তাই তো সে বলেছে। আরও সে বলেছে যে, তার বিরুদ্ধে ভগবানের বা শয়তানের চক্রান্তের ফলে অলিভার যখন আপনাদের আশ্রয়ে এসে পড়েছে, তখন তার আসল পরিচয় জানার জন্যে আপনারা নাকি হাজার হাজার পাউণ্ড খরচ করতেও পেছ-পা হবেন না। যাক্, রাত হয়ে গেছে—আমি এখন চলি, নইলে ওরা আমাকে সন্দেহ করবে।"

রোজ্ বললো: "তা, এ-খবর নিয়ে আমি কি করবো? আর, তুমিই বা সেখানে ফিরে যাবে কেন? তুমি তো বলছো যে, তোমার সঙ্গীরা সব সাংঘাতিক লোক। আমি বরং পাশের ঘর থেকে একজন ভদ্রলোককে ডেকে আনি, যিনি আধঘণ্টার মধ্যে তোমাকে একটা নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়ে রাখার ব্যবস্থা করবেন।"

ন্যান্সি বললো: "না না, তা করবেন না। আমাকে সেখানে ফিরে যেতেই হবে। ওই চোরেদের মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক যে-লোকটা, তাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না আমি। এমন কি যে গ্লানিময় জীবন আমি এখন কাটাচ্ছি, তা থেকে রক্ষা পাবার জন্যেও আমি তার সঙ্গ ছাড়তে পারবো না।"

রোজ্ বললো: "কিন্তু নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যখন একজন বালককে বাঁচাবার জন্যে এত রাতে ছুটে এসেছো, তখন আমার বিশ্বাস—তোমার ভুল শোধরাবার এখনও উপায় আছে।" কথা বলতে বলতে রোজের চোখে জল এল।

হাতজোড় করে রোজ্ আবার বললো: "আমার অনুরোধ রাখো—একজন মেয়েমানুষ হয়ে আমি তোমার কাছে আবেদন করছি—ভালো পরিবেশে রেখে তোমাকে রক্ষা করার সুযোগ দাও আমাকে।"

ন্যান্সি হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদতে কাঁদতে বললো: "আপনিই সর্বপ্রথম আমাকে নানা সৎ কথা বললেন। উঃ, কয়েক বছর আগেও যদি ওসব শুনতুম, তাহলে হয়তো নিজেকে বাঁচাতে পারতুম। কিন্তু এখন বড্ডো দেরী হয়ে গেছে—ফেরার পথ আর নেই।"

রোজ্ বললো: "দেরী মোটেই হয়নি।"

আর্তকণ্ঠে ন্যান্সি চেঁচিয়ে উঠলো: "দেরী হয়েছে—দেরী হয়েছে!

আমি তাকে এখন কিছুতেই ছাড়তে পারবো না, আমি তার মৃত্যুর কারণ হতে পারবো না।"

রোজ্ বললো : "তার মৃতুই বা হবে কেন ?"

ন্যান্‌সি বললো : "কেউ-ই তাকে বাঁচাতে পারবে না। আপনাকে যা বললাম তা যদি তাদের কাউকে বলি, তাহলে তার মৃত্যু নিশ্চিত।"

রোজ্ বললো : "যে-লোক আজ বাদে কাল ফাঁসির দড়ি গলায় দেবে, তার জন্যে কেন তুমি নিজের ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিচ্ছো তা বুঝতে আমার বুদ্ধিতে কুলোয় না। যা হোক, তুমি যে খবর আমাকে দিলে, তা নিয়ে তদন্ত করতে হবে। এর পরে হয়তো তোমার আরও সাহায্য দরকার লাগতে পারে। তখন তোমাকে কোথায় পাবো ?"

ন্যান্‌সি বললো : "আপনি যদি আমাকে কথা দেন যে আমার ব্যাপারটা গোপন রাখবেন, তাহলে বলতে পারি প্রতি রবিবার রাত এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত আমি লণ্ডন-ব্রিজের ওপর ঘুরে বেড়াবো, অবশ্য যদি বেঁচে থাকি। আপনি কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিন যে, হয় আপনি একাকিনী আমার সঙ্গে দেখা করবেন, নয় তো এমন একজনকে নিয়ে আসবেন যে অন্য কারও কাছে এ-বিষয়ে কিছু বলবে না।"

রোজ্ এরকম প্রতিশ্রুতি দিলে ন্যান্‌সি চলে গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

সে-রাতে রোজ্ ঘুমোতে পারলো না। ভোরবেলা সে হ্যারিকে চিঠি লিখে সব ব্যাপার জানিয়ে পরামর্শ নেবে বলে ঠিক করলো।

পরদিন সকালে চিঠি লিখতে শুরু ক'রে কি লিখবে ভাবছে, এমন সময়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলো অলিভার। সে জানালো যে, এইমাত্র সে মিস্টার্ ব্রাউন্‌লোকে একটা বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে এবং এক টুকরো কাগজে সেই বাড়ির ঠিকানা লিখে এনেছে। রোজ্ কাগজখানা নিয়ে দেখলো, ক্র্যাডেন স্ট্রীটের একটা বাড়ির ঠিকানা। তখনি সে অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে একখানা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি ক'রে বেরিয়ে পড়লো। মিসেস্ মেইলীকে শুধু জানিয়ে গেল যে, তারা ঘণ্টাখানেকের জন্যে একবার বেরোচ্ছে।

অলিভারকে বাইরে গাড়িতে বসিয়ে রেখে রোজ্ ভেতরে গিয়ে মিস্টার

ব্রাউন্‌লোর সঙ্গে দেখা করলো। তিনি তখন মিস্টার গ্রীম্‌উইগের সঙ্গে কি একটা নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

মিঃ ব্রাউন্‌লো রোজ্‌কে সাদরে গ্রহণ ক'রে বললেন: "এসো, মা, এসো! ইনি আমার বন্ধু মিস্টার গ্রীম্‌উইগ্।...গ্রীম্‌উইগ্, তুমি একটু বাইরে যাও।"

রোজ্ বাধা দিয়ে বললো: "না-না, উনিও বসুন এখানে। আমি যে-ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি তা উনিও জানেন।"

মিঃ ব্রাউন্‌লোর কথায় চেয়ার ছেড়ে উঠেছিলেন মিঃ গ্রীম্‌উইগ্, কিন্তু রোজের কথায় আবার ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লেন।

মিঃ ব্রাউন্‌লোকে রোজ্ বললো: "এক সময়ে আপনি আমার এক বালক বন্ধুকে দয়া করেছিলেন। তাকে আপনারা 'অলিভার টুইস্ট' বলে জানেন।

মিঃ গ্রীম্‌উইগ্ একখানা মোটা বই খুলে পড়ার ভান করছিলেন, রোজের মুখে অলিভারের নাম শুনে তাঁর হাত থেকে বইখানা সশব্দে প'ড়ে গেল—হাঁ ক'রে রোজের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

মিঃ ব্রাউন্‌লোও রোজের কথায় কম বিস্মিত হননি। তিনি বললেন: "দয়ার কথা বাদ দাও, মা! তুমি যার নাম করলে, তার বিষয়ে আমি বড়ই হতাশ হয়ে গেছি।"

মিঃ গ্রীম্‌উইগ্ বলে উঠলেন: "ছোঁড়া যদি বদ না হয় তো আমি আমার মাথা খাবো!"

রোজ্ বললো: "আপনার মাথা আপনারই থাক্...তবে আমার কাছ থেকে শুনুন, আপনারা যাকে বদ ছেলে বলছেন, তার মতো ভালো ছেলে বড় একটা দেখা যায় না।"

মুখ ভার করে মিঃ গ্রীম্‌উইগ্ বললেন: "আমার বয়স একষট্টি, এর মধ্যে অনেক কিছুই ভালো-মন্দ দেখলাম...ওই অলিভার-ছোঁড়াটা যে একটা আস্ত শয়তান এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন: "ওঁর কথায় কিছু মনে করো না, মা! উনি যা বলেন, তা অন্তর দিয়ে বলেন না।"

মিঃ গ্রীম্‌উইগ্ গর্জে উঠলেন: "আলবৎ বলি।"

রেগেমেগে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন: "কখনই নয়।"

মিঃ গ্রীম্‌উইগ্ বললেন: "যে একথা মানে না তার মাথায় ছাই পোরা।"

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন : "যে এত জেদ করে কথা বলে তার মাথাটা ভেঙে দেওয়া উচিত।"

মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌, তাঁর লাঠিটা মেঝেয় ঠুকে বললেন : "সেও দেখতে চায়, তার মাথা ভাঙার সাহসটা কার।"

রোজ্‌, অবাক হয়ে দেখে, এতখানি রাগারাগির পরও দুজন বুড়ো আগের মতোই আবার হাসাহাসি করে প্রত্যেকে একই নস্যির দানি থেকে এক-এক টিপ নস্য নাকে গুঁজে একে অপরের হাতে হাত মেলালেন। বিচিত্র এ তাঁদের বন্ধুত্ব!

তারপর মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন : "নাও, মা, এখন তোমার আসল কথাটা বলো। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ছেলেটার ভালো হয়, কিন্তু বড় দুঃখেই তার বিষয়ে খারাপ ধারণা পোষণ করতে হলো আমাকে।"

রোজ্‌, এবার অলিভারের বিষয়ে যতটুকু জানতো তা অল্প কথায় দুজনকেই জানালো, কেবল ন্যান্‌সির কথাটা গোপন রাখলো। ন্যান্‌সির কথাটা মিস্টার ব্রাউন্‌লোকে গোপনে বলবে বলে রোজ্‌ সংকল্প করলো।

রোজের কথা শুনে আনন্দে মিঃ ব্রাউন্‌লোর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন : "বড়ো আনন্দ দিলে মা, বড়ো আনন্দ দিলে! আমি কিন্তু তোমাকে একটু বকবো—তুমি অলিভারকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?"

রোজ্‌, বললো : "অলিভার আমার সঙ্গেই এসেছে···বাইরের গাড়িতে বসে সে অপেক্ষা করছে।"

এ-কথা শুনে মিঃ ব্রাউন্‌লো ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মিঃ ব্রাউন্‌লো বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌, আসন ছেড়ে উঠে অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। তারপর হঠাৎ রোজের কানে চুপিচুপি বললেন : "আমার অনুমান যে মিথ্যে হয়েছে, তার জন্যে আমিও খুব খুশী হয়েছি!"

এমন সময় অলিভারকে নিয়ে মিঃ ব্রাউন্‌লো ঘরে ঢুকলেন। মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌, উঠে অলিভারকে আবেগে জড়িয়ে ধরলেন।

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন : "ভালো কথা, আর একজনের কথা ভুললে চলবে না আমাদের!" এই বলে তিনি মিসেস্‌ বেডুইনকে ডেকে পাঠালেন।

মিসেস্‌ বেডুইন ঘরে ঢুকে হুকুমের অপেক্ষায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে

রইলেন। তাই দেখে মিঃ ব্রাউন্‌লো চেঁচিয়ে উঠলেন: "আঃ, বেঁড়ুইন! দিন দিন কি চোখ তোমার খারাপ হয়ে যাচ্ছে?"

মিসেস্ বেড়ুইন উত্তর দিলেন: "তা কর্তা, আমার মতো বয়সে তো আর চোখ ভালো হয় না।"

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন: "তা আমারও জানা আছে। এখন একবার তোমার চশমাটা চোখে দিয়ে দেখ দেখি, এখানে তোমার কোনো হারা-নিধির খোঁজ পাও কিনা?"

মিসেস্ বেড়ুইন তাঁর জামার পকেটে চমশা হাতড়াতে লাগলেন। কিন্তু অলিভার আর চুপ করে থাকতে পারলো না—ছুটে গিয়ে মিসেস্ বেড়ুইনকে জড়িয়ে ধ'রে ডাকলো: "ধাই-মা!"

—"অলিভার না? জয় ভগবান্! ওরে, তুই এখানে আবার ফিরে আসবি, এ আমি জানতুম। কোথায় ছিলি রে বাছা এতদিন?···ঠিক সেই মুখ, সেই চোখ! এ-মুখ, এ-চোখ, এ-হাসি যে বরাবর আমার মনে গেঁথে আছে!"

বলতে-বলতে হাসি-কান্নায় অধীর হয়ে উঠলেন মিসেস্ বেড়ুইন।

সুযোগ বুঝে রোজ্ গোপনে মিস্টার ব্রাউন্‌লোকে ন্যান্‌সির কথা জানালো।

মিঃ ব্রাউন্‌নো বললেন: "আমি রাত আটটার সময় হোটেলে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো, মা! এর মধ্যে তুমি মিসেস্ মেইলীকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে রেখো!"

কতকটা নিশ্চিত হয়ে রোজ্ অলিভারকে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলো।

রাতে মিঃ ব্রাউন্‌লো হোটেলে এলেন। ডাক্তার লস্‌বার্নও সেখানে হাজির ছিলেন। মিসেস্ মেইলী তাঁকে আগেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন অলিভারের ব্যাপারটা তাঁকে জানাবার জন্যে। ডাক্তার লস্‌বার্ন সমস্ত শুনে তো রেগেই আগুন! তখনি সমস্ত দলটাকে পুলিসে ধরিয়ে দেবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। মিস্টার ব্রাউন্‌লো তাঁকে বেশ কয়েক-বার ধমক দিয়ে অতি কষ্টে থামালেন।

ডাক্তার লস্‌বার্ন তবুও বললেন: "আমি তাদের সব ক'টাকে পাঠিয়ে দেবো—"

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন: "তাদের কোথায় পাঠাবেন, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এখন আমাদের প্রধান কাজ হলো, অলিভারের বাপ-

মায়ের পরিচয় খুঁজে বের করা এবং তার বাপের সম্পত্তির ওপর তার দাবী-দাওয়ার বিষয়ে ব্যাপারটা কি তা জানা।"

ডাক্তার লস্‌বার্ন শান্ত হয়ে বললেন: "তা তো বটে! তবে তাদের কয়েকটাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো চাই-ই, আর বাকীগুলোকে পাঠাতে হবে দীপান্তরে।"

হেসে মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন: "তারা নিজেরাই নিজেদের ফাঁসি আর দ্বীপান্তরের পথ খোলসা ক'রে নেবে। কিন্তু রোজ্‌ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ন্যান্‌সিকে, তা একটুও না ভেঙে আমাদের কাজে এগোতে হবে। ন্যান্‌সির সাহায্যে মঙ্ক্‌স্‌কে চিনে নিয়ে, তাকে একলা পাকড়াও ক'রে আনতে হবে। কিন্তু রবিবারের আগে তো ও মেয়েটার দেখা পাচ্ছি নে—আজ তো সবে মঙ্গলবার। এ-ক'টা দিন আমাদের চুপচাপ থাকতে হবে—অলিভারকে পর্যন্ত কিছু জানতে দেওয়া হবে না। আর, আমি আমার বন্ধু মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌কে দলে নিতে চাই। লোকটা অদ্ভুত প্রকৃতির হলেও খুব চতুর—বিশেষ সাহায্য করতে পারবে আমাদের। সে ওকালতি করতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে পেশা ছেড়ে দিয়েছে, কেননা বিশ বছরের মধ্যে একটার বেশী মোকদ্দমা আসেনি তার হাতে।"

ডাক্তার লস্‌বার্ন এ-প্রস্তাব মেনে নিয়ে বললেন: "তাহ'লে আমিও কিন্তু আমার একজন বন্ধুকে দলে নেবো। সে ওই বৃদ্ধা মহিলার পুত্র এবং এই তরুণীর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু।" এই ব'লে তিনি মিসেস্‌ মেইলী ও রোজ্‌কে দেখিয়ে দিলেন।

মিসেস্‌ মেইলী জানালেন যে, এ তদন্ত যাতে সফল হয় তার জন্যে তিনি টাকাপয়সা খরচ করতে কসুর করবেন না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যে-রাতে সাইক্‌স্‌কে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ন্যান্‌সি রোজের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো, সে-রাতে লণ্ডনের পথে হেঁটে আসছিলো একটা পুরুষ ও একটা স্ত্রীলোক।

পুরুষটা রোগাটে, হাত-পাগুলো ল্যাং-ল্যাং করছে, গাঁটগুলো বারকরা। তার কাঁধে একটা লাঠির ডগায় একটা বোচকা বাঁধা। তার বয়স ঠাওর করা কঠিন। স্ত্রীলোকটার চেহারা মোটাসোটা…তার পিঠের ভারী বোঝাটা বয়ে নিয়ে যেতে তার কষ্ট হচ্ছে না মোটেই।

লম্বা-লম্বা পা ফেলে অনেকটা এগিয়ে এসেছিলো পুরুষটা। এবারে বোঝার ভারে নুয়ে পড়া স্ত্রীলোকটার উদ্দেশে পেছন ফিরে বললোঃ "চট্‌পট্‌ চ'লে আয় শার্লটি! তুই দেখছি কুড়ের বেহদ্দ!"

মেয়েটা বললোঃ "বোঝাটা বড় ভারী, নোয়া।"

—"ভারী! কি বলছিস্‌ তুই? ভারী-বোঝা বইবার জন্যেই তো মেয়েদের জন্ম!···আবার থামলে কেন? আচ্ছা, থামো! মিঃ সোয়ারবেরী ধাওয়া ক'রে এসে, হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাবে তোকে।"

শার্লটি বললোঃ "কিন্তু শুধু আমাকে কেন বলছো? তোমাকেও তো নিয়ে যাবে।"

—"তুই হাতবাক্সো থেকে টাকা চুরি করেছিস্‌ যে!"

—"আমি চুরি করেছি তো তোমার জন্যে।"

—"কিন্তু সে টাকা কি আমি নিজের কাছে রেখেছি?"

না, নোয়া ক্লেপোল্‌ সে টাকা নিজে রাখেনি—শার্লটির কাছে সে রেখে দিয়েছে। অবশ্য, তার কারণ এ নয় যে, সে শার্লটিকে বিশ্বাস করে। আসল কথা হলো, একান্তই যদি ধরা পড়ে, তাহ'লে সে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ ক'রে বলতে পারবে যে, সে টাকা নেয়নি, নিয়েছে শার্লটি।

খুব সাবধানে সদর-রাস্তা পার হয়ে গলি-ঘুঁজি দিয়ে তারা সেণ্ট জন রোডে পড়লো। একটার পর একটা সরাইখানার মধ্যে উঁকি মেরে দেখলো নোয়া, কিন্তু সবগুলোতে ভিড়। কোনোটাই পছন্দ হলো না তার। শেষ-পর্যন্ত সে ঢুকলো 'ত্রিভঙ্গ' নামে একটা অতি নোংরা সরাইখানায়।

সরাইখানায় একটা ইহুদী-ছোকরা ছাড়া তখন আর কেউ ছিলো না। তার কাছে নোয়া রাত কাটাবার জায়গা চাইতে সে বললোঃ "কইতে নারলাম থাকতে পারবেন কিনা—খুঁজ্‌ নিয়ে দেখচি!"

—"আগে আমাদের হাত-মুখ ধোবার জল, কিছু মাংস আর মদ তো দিয়ে যাও!"

ইহুদী-ছোকরার নাম বার্নি। নোয়ার হুকুম তামিল ক'রে তাদের খেতে বসিয়ে দিয়ে ওপরে গেল। ওপরে যে-ঘরে যাবে, সেখান থেকে নীচের ঘরের অতিথিদের দেখা যেতো এবং তাদের কথাবার্তা পর্যন্ত শোনা যেতো! বার্নি সে-ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, এমন সময়ে ফ্যাগিন্‌ সেখানে এসে হাজির হতেই বার্নি ফ্যাগিন্‌কে বললোঃ "আঁস্তে! লিঁচের ঘঁরে নঁতুন মঁনীষ্যি এঁইচে। পাঁলিয়ে এঁইচে উঁআরা—তুঁমার পঁথের পঁথিক।"

একথা শুনে ফ্যাগিন্ ওপরের সেই ঘরে ঢুকে নোয়া ও শার্লটির কথা-বার্তা শুনতে লাগলো।

নোয়া ক্লেপোল্ তখন শার্লটিকে বলছিলোঃ "আমি ভদ্দর নোক হ'তে চাই।"

শার্লটি বললোঃ "আমিও তো তাই চাই, কিন্তু রোজ-রোজ তো আর হাত-বাক্সো ভাঙা যাবে না।"

নোয়া বললোঃ "চুলোয় যাক্ হাত-বাক্সো! ও ছাড়াও অনেককিছু আছে ভাঙবার—পকেট, ছেলেমেয়েদের হাতব্যাগ, বাড়ি, ডাকগাড়ি, ব্যাঙ্ক, আরো কত-কি! একটা লুঠেরার দলে মেশাই আমার ইচ্ছে। তারপর, তুই একাই তো পঞ্চাশটা মেয়ের সমান—তোর মতো চালাক আর ধড়িবাজ মেয়ে আমি আর কখনও দেখিনি।"

নোয়ার মুখে নিজের প্রশংসা শুনে আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠলো শার্লটি। নোয়া আবার বললোঃ "তা ব'লে লাফিয়ে উঠিস্ নে যেন। আমি চাই একটা লুটেরা-দলের সর্দার হ'তে।"

এমন সময় ফ্যাগিন্ সে-ঘরে ঢুকে কিছু মদ আনার হুকুম দিয়ে নোয়াকে জিজ্ঞেস করলোঃ "মশায়ের বুঝি পাড়া-গাঁ থেকে আসা হচ্ছে?"

উল্‌টে নোয়া জিজ্ঞাসা করলোঃ "বুঝলেন কি ক'রে?"

নোয়ার জুতোর দিকে আঙুল দেখিয়ে ফ্যাগিন্ বললোঃ "এ শহরে তো এত ধুলো নেই, ভায়া?"

—"আপনার নজর তো খুব। হাঃ-হাঃ-হাঃ! দেখেছিস্ শার্লটি?"

ফ্যাগিন্ বললোঃ "শহরে থাকতে গেলে নজর থাকা চাই বই কি! এখানে পুরুষকে যে সবসময় হাতবাক্সো, মেয়েদের হাতব্যাগ, বাড়ি, ডাকগাড়ি, আর ব্যাঙ্ক লুঠ করতে হয়।"

একথা শুনেই ভয়ে আঁতকে উঠলো নোয়া। মুখখানা তার ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

ফ্যাগিন্ তার কাছে এগিয়ে এসে বললোঃ "তোমার কপাল ভালো ভায়া যে, কথাটা শুধু আমিই শুনেছি।"

নোয়া শার্লটিকে দেখিয়ে আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে বললোঃ "আমি কিছু নেইনি—এসব ওর কাজ।"

ফ্যাগিন্ বললোঃ "যেই নিয়ে থাক, তাতে ক্ষতি কোনো নেই। 'ত্রিভঙ্গের' চেয়ে নিরাপদ জায়গা সারা লণ্ডনে আর নেই। আর আমিও তো ওপথেরই পথিক। এই সরাইখানার লোকেরাও তাই। তুমি ঠিক

জায়গাতেই এসে পড়েছো ভায়া! আমার একজন বন্ধু আছে, যে তোমার মনের ইচ্ছে সফল করতে পারে।"

এ কথার পরে ফ্যাগিনের অনুরোধে শার্লটিকে মালপত্তর ওপরে রেখে আসতে হুকুম করলো নোয়া। শার্লটি চলে গেলে ফ্যাগিন্ জানতে চাইলো, নোয়া তার বন্ধুর দলে যোগ দিতে রাজী আছে কিনা।

নোয়া জিজ্ঞাসা করলোঃ "বন্ধুটি কি-দরের ব্যাপারী?"

ফ্যাগিন্ জানালো যে, সে ব্যবসাদারদের শিরোমণি এবং পাক্কা শহুরে—তার দলে কোনো গেঁয়ো লোক নেই। অবশ্য, তার দলে মিশতে হ'লে নোয়া মিঃ সোয়ার্‌বেরীর হাতবাক্সো ভেঙে যে কুড়ি পাউণ্ডের নোটগুলো চুরি করেছে, তার সব ক'টাই প্রবেশ-মূল্য হিসেবে দিতে হবে। ফ্যাগিন্ নোয়াকে বোঝালে যে, এ নোটগুলোর কোনো দাম নেই নোয়ার কাছে, কেননা সে এ নোটগুলো ভাঙাতে পারবে না কিছুতেই। নোটের নম্বরগুলো নিশ্চয়ই মিঃ সোয়ার্‌বেরীর কাছে আছে, তাই সেগুলো ভাঙাতে গেলেই ধরা পড়তে হবে তাকে।

নোয়া জিজ্ঞাসা করলোঃ "আচ্ছা, তাহ'লে মাইনে কত করে পাবো আমি?"

ফ্যাগিন্ বললোঃ "মাইনে! মাইনে আবার কি? বিনিপয়সায় থাকতে পাবে, খেতে পাবে, তামাক-মদও পাবে, তাছাড়া তুমি আর তোমার বান্ধবী যা রোজগার করবে তারও অর্ধেক পাবে।"

অন্য সময় হ'লে অর্থপিশাচ নোয়া এত কমে রাজী হতো না, কিন্তু এখন প্যাঁচে প'ড়ে আম্‌তা-আম্‌তা ক'রে বললোঃ "কিন্তু আমি হাল্‌কা কাজ নিতে চাই।"

ফ্যাগিন্ বললোঃ "বেশ তো! তুমি তো তোমার বান্ধবীর কাছে গল্প করছিলে যে, গোয়েন্দাগিরি ধরনের কাজ পেলে তোমার ভালো লাগবে। আমার বন্ধুরও একজন গোয়েন্দা দরকার।"

নোয়া বললোঃ "কিন্তু তাতে তো কিছু আয় হবে না!"

ফ্যাগিন্ বললোঃ "তা বটে! আচ্ছা, বুড়ীদের হাতব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার কাজটা কেমন লাগবে তোমার?"

—"উঁহু, ওরা যে বড্ডো বেশী চেঁচামেচি করে থাকে! ওটা বাদ দিয়ে অন্য কোনো কাজ বাতলাও।"

—"বেশ, তাহ'লে ছোকরা-ছেনতাই করো।"

—"সে আবার কি ধরনের কাজ?"

—“ছোটো ছেলেরা অনেক সময়ে তাদের মায়েদের কাছ থেকে টাকাটা-সিকিটা নিয়ে দোকান-বাজারে যায়। সে সময়ে তাদের হাত থেকে সেগুলো ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে আসা, এই কাজ আর কি! পয়সাকড়ি ছোঁড়ারা হাতে রেখেই পথ চলে ঢিমে-চালে, সে সময় স্রেফ একটা ধাক্কা দিয়ে তাদের মাটিতে ফেলে দেওয়া, আর হাতের পয়সাকড়িগুলো ছিনিয়ে নিয়ে স'রে পড়া, বুঝলে কিনা—হা-হা-হা-হা-হা!”

নোয়াও হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। সে বললোঃ “ঠিক-ঠিক, এ কাজটাই ঠিক যুতসই হবে আমার।”

এমন সময় শার্লটি ফিরে এলো। ঠিক হলো, কাল বেলা দশটার সময়ে ফ্যাগিন্ আসবে তার বন্ধুর সঙ্গে নোয়াকে আলাপ করিয়ে দিতে। ফ্যাগিনের কাছে নোয়া নিজের পরিচয় দিলো মিস্টার বোল্টার নামে, আর শার্লটিকে নিজের স্ত্রী ব'লে পরিচয় দিলো। এরপর ফ্যাগিন্ বিদায় নিলো।

* * *

এ ক'দিনের মধ্যেই খুব রোগা হয়ে গেছে ন্যান্সি। বেশীর ভাগ সময়েই সে ঘরে বসে থাকে, আর কি-যেন ভাবে—কখনও বা অকারণে হেসে ওঠে। নিজের মনে সে চমকে ওঠে, সে কি ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাচ্ছে?

ফ্যাগিনের মনেও সন্দেহ জেগেছে ন্যান্সির আচরণে। দলের কোনো কাজেই আজ আর ন্যান্সির উৎসাহ নেই, অথচ ফ্যাগিন্ তো ভাল করেই জানে—তার দলের সেরা মেয়ে ছিলো ন্যান্সি—আরও মেয়েটার কড়া নজর ছিলো কি করে দলের কাজগুলো আরও ভালোভাবে চালানো যায়। ন্যান্সির এসব গুণের জন্যেই তো দলের অতি গোপন খবরও তাকে সে জানাতো—এক কথায় ন্যান্সিকে সে বিশ্বাস করতো সব ব্যাপারে। তাছাড়া, ন্যান্সিকে সঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিয়েছে সাইক্স্—তার সবচেয়ে বড়ো সাগরেদ! সে-হিসেবে ন্যান্সির স্থানও অনেক উঁচুতে তার দলের মধ্যে।

সেই ন্যান্সি আজ একরকম দলছাড়া—সাইক্সের নোংরা ঘরের এক কোণে বন্দী বললেই হয়।

যতোই এসব ভাবে ফ্যাগিন্ ততোই অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে তার মন।

রবিবার রাতে সাইক্সের আস্তানায় বসে ফ্যাগিন্ পরামর্শ করছে সাইক্সের সাথে, এমন সময় গির্জার ঘড়িতে ঢং-ঢং ক'রে এগারোটা বাজলো।

সাইক্‌স্ বললোঃ "কাজ-কর্মের পক্ষে আজকের রাতটা খুবই চমৎকার!"

ফ্যাগিন্ কোনো জবাব না দিয়ে ন্যান্‌সির দিকে নীরবে ইশারা করলো। সাইক্‌স্ দেখলো, ন্যান্‌সি বাইরে যাবার পোশাক পরছে। সে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলোঃ "বলি, এত রাতে চললে কোথায়?"

—"বেশী দূরে নয়।"

—"যা জিজ্ঞেস করলাম তার জবাব দাও। কোথায় যাচ্ছো?"

—"জানি নে কোথায় যাচ্ছি।"

সাইক্‌স্ চাপা-রাগে বললোঃ "কোথায় যাচ্ছো, তা না বললে তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না।"

আসল ব্যাপারটা এড়িয়ে যাবার জন্যে ন্যান্‌সি বললোঃ "শরীরটা ভালো নেই, তাই একটু খোলা বাতাসে বেড়িয়ে আসতে চাই।"

সাইক্‌স্ গম্ভীরভাবে জানালোঃ "তা যদি হয়, তাহ'লে জানলা খুলে দিয়ে জানলার সামনে বসো, যথেষ্ট হাওয়া পাবে।"

ন্যান্‌সি তবু বাইরে যাবার জন্যে জেদ ধরলো।

সাইক্‌স্ তখন ঘরের দরজায় কুলুপ এঁটে দিয়ে বললোঃ "যেখানে আছো, সেখানেই ব'সে থাকো চুপটি ক'রে···হাওয়া খেয়ে আর কাজ নেই তোমার।"

ঘরের ভেতর থেকে কাঁদকাঁদ গলায় ন্যান্‌সি চেঁচিয়ে উঠলোঃ "জানো, বিল, তুমি আমার কি ক্ষতি করছো?"

"কি! কি করছি আমি!"—ফ্যাগিনের দিকে তাকিয়ে সাইক্‌স্ বললোঃ "ছুঁড়িটা আজ ক্ষেপে গেছে, নইলে আমার সঙ্গে এমন বেয়াড়া ভাবে কথা বলতে সাহস করতো না!"

একথা শুনে ন্যান্‌সি দু'হাতে নিজের বুক চেপে ধ'রে আপন মনে ব'লে উঠলোঃ "তোমরা দু'জনে আমাকে পাগল না ক'রে ছাড়বে না? দরজা খুলে দাও এখনি, আমাকে যেতে দাও এই মুহূর্তে।"

সাইক্‌স্ বললোঃ "না।"

মাটিতে পা ঠুকে ন্যান্‌সি চেঁচিয়ে ফ্যাগিন্‌কে বললোঃ "সাইক্‌স্‌কে বলো আমাকে ছেড়ে দিতে। এতে ওর ভালো হবে।"

সাইক্‌স্ ধমক দিয়ে বলে উঠলোঃ "ফের বেয়াড়াপনা করছো? আর একটুও গলার আওয়াজ শুনি তো কুকুরটা তোমার টুটি টিপে একেবারে চুপ করিয়ে দেবে!"

দরজার সামনে মেঝের উপর বসে পড়ে ন্যান্‌সি আবার অনুনয়ের সুরে বললো : "আমাকে যেতে দাও বিল। তুমি জানো না, আমার কি ক্ষতি তুমি করছো—মাত্র এক ঘণ্টার জন্যে আমাকে ছেড়ে দাও !"

সজোরে ন্যান্‌সির হাত টেনে ধরে সাইক্‌স্‌ চোখ রাঙিয়ে বললো : "চোপরাও হারামজাদি ! মেঝে থেকে ওঠ্‌ !"

—"উঠবো না—যেতে না দিলে এখান থেকে উঠবো না !"

ন্যান্‌সি চেঁচাতে লাগলো। তখন সাইক্‌স্‌ তাকে টেনে হিঁচড়ে পাশের একটা ছোটো কুঠ্‌রির মধ্যে আটকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলো।

গির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ন্যান্‌সি কিছুটা শান্ত হলো—বাইরে যাবার আশা ছেড়ে দিলো সে।

রাতে আর বাইরে যাবার চেষ্টা করবে না—সাইক্‌স্‌কে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ন্যান্‌সি ছাড়া পেলো সেই ছোটো কুঠ্‌রি থেকে।

সাইক্‌স্‌ বললো ফ্যাগিন্‌কে : "ভেবেছিলাম, ওকে পোষ মানিয়েছি, কিন্তু, না, এখনও ঠিক আগের মতোই ও বেয়াড়া আছে।"

এ-কথা শুনে ন্যান্‌সি খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হেসে উঠলো !

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ফ্যাগিন্‌ সাইক্‌সের কাছ থেকে বিদায় নিলো। চলে যাবার সময় ফ্যাগিন্‌কে নীচে পর্যন্ত এগিয়ে দিলো ন্যান্‌সি হাতে বাতি ধরে।

ন্যান্‌সিকে একা পেয়ে ফ্যাগিন্‌ বললো : "ন্যান্‌সি, তোমার কষ্ট দেখে আমার কান্না পাচ্ছে। সাইক্‌স্‌ একটা বাঁদর। তোমার কদর বোঝে না সে। সাইক্‌সের হাত থেকে যাতে রেহাই পাও তার ব্যবস্থা করবো শীগ্‌গির।"

ন্যান্‌সি চুপ করে শুনে গেলো ফ্যাগিনের কথা। কোনো জবাব না পেয়ে ফ্যাগিন্‌ বুঝলো—তার কথাটা ন্যান্‌সির মনে ধরে নি।

—"আচ্ছা, এ নিয়ে পরে কথা হবে !" এই বলে দরজার বাইরে পা দিলো ফ্যাগিন্‌।

রাস্তায় বেরিয়ে ফ্যাগিন্‌ ন্যান্‌সির আজকের আচরণটা আর একবার তলিয়ে দেখলো। ন্যান্‌সি কেন এত রাতে এক ঘণ্টার জন্যে বাইরে বের হবার জেদ ধরলো—বেরোতে না দিলে ভাল হবে না বলে সাইক্‌স্‌কে শাসালো। ফ্যাগিনের সন্দেহ হলো, ন্যান্‌সি নিশ্চয়ই গোপনে কোনো কাজকারবার করছে, অথচ দলের কেউই এসব জানে না—এমন কি সাইক্‌স্‌ও তা জানে না।

ব্যাপারটা ভালো ঠেকলো না ফ্যাগিনের। যতোই সে এসব ভাবে ততোই তার সন্দেহ বেড়ে যায় ন্যান্‌সির ওপর। শেষে ন্যান্‌সির ওপর গোপনে নজর রাখার ব্যবস্থা করবে বলে সে ঠিক করলো।

* * *

ভোরবেলা ফ্যাগিন্ তার নতুন সহচরের দেখা পেলো। সে এসেই কাঁড়ি কাঁড়ি খাবার গিলতে লাগলো।

ফ্যাগিন্ এগিয়ে এসে ডাকতেই নোয়া বললো: "খাওয়া শেষ হওয়ার আগে যেন কোনো কাজ করতে ব'লো না আমাকে।"

মনে মনে নোয়ার মুণ্ডপাত করতে করতে ফ্যাগিন্ বললো: "তা, খেতে খেতে তুমি নিশ্চয়ই কথা বলতে পারো?"

—"হ্যাঁ তা পারি। কথা বলতে বলতে খেলে বেশী খাওয়া হয়ে যায়।"—এই ব'লে নোয়া বেশী ক'রে খানিকটা রুটি কেটে নিয়ে বললো: "শার্লটি গেল কোথায়?"

—"তাকে আমি বাইরে পাঠিয়েছি, তোমার সঙ্গে এখানে বসে গোপনে আমার আলোচনা করার জন্যে।"

নোয়া বললো: "তা, যাবার আগে শার্লটি আমার জন্যে মাখন মাখিয়ে খানকয়েক টোস্ট ক'রে দিয়ে গেলে তো পারতো।"

ফ্যাগিন্ তোষামোদের সুরে বললো: "কাল কিন্তু তোমার কাজ খুব চমৎকার হয়েছে—প্রথম দিনেই ছ' শিলিং সাড়ে ন' পেন্স! এরকম ছোকরা-ছেনতাই করেই তোমার বরাত ফিরে যাবে।"

এভাবে নানা মিষ্টি কথায় নোয়াকে খুশী করে ফ্যাগিন্ শেষে নিজের একটা কাজ ক'রে দেবার জন্যে অনুরোধ করলো তাকে। কাজটায় কোনো বিপদের ভয় নেই—কেবল দলের একটা মেয়ের পেছন পেছন গিয়ে গোয়েন্দাগিরি করা। নোয়াকে জানতে হবে—সেই মেয়েটা লুকিয়ে কোন্ জায়গায় কাদের সাথে দেখা করে—কি ধরনের কথাবার্তা বলে বা কাদের কাছ থেকে কিরকম পরামর্শ শোনে। এসব খবর যোগাড় করে ফ্যাগিন্‌কে গোপনে জানাতে হবে, আর এই সামান্য কাজের জন্যে ফ্যাগিন্ পুরস্কার হিসেবে নোয়াকে এক পাউণ্ড বখশিস্ দেবে—একেবারে এক পাউণ্ড! টাকার অঙ্কটা ফ্যাগিন্ বেশ একটু জোর দিয়ে বললো, যাতে নোয়ার মন ভেজে।

নোয়া রাজী হয়ে জিজ্ঞাসা করলো: "তা, আমাকে কোথায় যেতে হবে?"

ফ্যাগিন্ বললো ঃ "আমি সময়মতো তোমাকে তা জানাব। তুমি মোটের ওপর তৈরী থেকো।"

* * *

নোয়া রোজই সেজেগুজে ব'সে থাকে—ফ্যাগিন্ রোজই হতাশ-মুখে এসে জানায় যে, এখনও সে-সময় আসেনি।

এরপর থেকে ফ্যাগিন্ রোজ ন্যান্সির খোঁজখবর নেয়, আর ন্যান্সির ওপর তার সন্দেহ যে মিথ্যে তা প্রমাণ হয়ে যায়। সাইক্সের কাছ থেকে ফ্যাগিন্ জানতে পারে যে আজকাল ন্যান্সি কি রকম যেন হয়ে গেছে—কিছুতেই ঘর থেকে বেরোতে চায় না।

সাইক্স্ বলে যে, সেদিনের রাতের ঘটনার পর থেকে ন্যান্সির অভিমান হয়েছে, যার জন্যে সে এরকম উদাস হয়ে থাকে।

ফ্যাগিন্ ন্যান্সির ওপর তার সন্দেহের কথা সাইক্স্কে বলে। কথাটা শুনেই সাইক্স্ হেসে গড়াগড়ি যায় ফ্যাগিনের ভোঁতা মগজ দেখে।

সাইক্স্ বলে ঃ "ন্যান্সি খুব জেদী মেয়ে—সে ইচ্ছে করলে সব কিছুই করতে পারে, কিন্তু বেইমানী সে কখনো করবে না। তাছাড়া আমাকে—" কথাটা আর শেষ না করে হেসে উঠলো সাইক্স্।

ফ্যাগিন্ বলে ঃ "কিন্তু যদি সে বেইমানী করে তাহলে তুমি কি করবে?"

সাইক্স্ বললো ঃ "সকলের যা করা হয় ওরও তাই করবো। যেদিন শুনবো ও বেইমানী করেছে, সেদিনই ওকে গলা টিপে মারবো।"

—"কথাটা মনে থাকে যেন। এর খেলাপ করো না কিন্তু!" ফ্যাগিন্ বলে ওঠে গম্ভীরভাবে।

সাইক্সের মতো অতোটা ন্যান্সিকে বিশ্বাস করতে পারে না ফ্যাগিন্, তাই ন্যান্সির ওপর কড়া নজর রাখে দিনের পর দিন।

ফ্যাগিন্ ভাবে যে সাইক্স্ আজকাল শরীর খারাপের জন্যে বাড়ি থেকে বেরোয় না, তাই ন্যান্সিও বেরোবার সুযোগ পাচ্ছে না বলে তার সন্দেহের কুয়াশা পরিষ্কার হচ্ছে না। এরকম সাতপাঁচ ভেবে সাইক্স্কে বাইরের একটা কাজে পাঠাবার চেষ্টা করলো ফ্যাগিন্। লোভে পড়ে সাইক্স্ও কাজটা হাতে নিলো এবং ঠিক করলো, আগামী রবিবারের রাতে যখন সকলে আমোদ-আহ্লাদে ডুবে থাকবে তখন সে ফ্যাগিনের দেওয়া কাজটা হাসিল করবে।

রবিবার সন্ধ্যার কিছু আগে ফ্যাগিন্ হাসতে-হাসতে এসে নোয়াকে

বললো : "আজ মনে হচ্ছে, সে-মেয়েটা বাড়ি থেকে রাতে বেরোবে। যে-লোকটাকে সে ভয় করে, সেও আজ রাতে বাড়িতে থাকবে না—ভোরের আগে সে ফিরবে না। নাও, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।"

জানা-পথের গোলক-ধাঁধা পেরিয়ে ফ্যাগিন্ আর নোয়া এসে হাজির হলো সাইক্‌সের আস্তানায়। নোয়া যে-ইহুদী ছোকরাকে সরাইখানায় দেখেছিলো, সে-ই দরজা খুলে দিলো এবং তার সাহায্যে নোয়া নিজে গা-ঢাকা দিয়ে ন্যান্‌সিকে ভালো করে দেখে নিলো।

রাত এগারোটায় ন্যান্‌সি বাড়ি থেকে বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গে নোয়া দূর থেকে তার পেছন পেছন যেতে লাগলো।

রাত সওয়া-এগারোটার সময়ে লণ্ডন ব্রিজের ওপর দু'টো মানুষকে দেখা গেল আগে পিছে—নোয়া খানিকটা তফাতে থেকে অতি সাবধানে পিছু নিয়ে চলেছে ন্যান্‌সির।

ঘন আঁধারে-ভরা রাত। যে-সব গৃহহারার দল ব্রিজের ওপরে রাতের আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিলো, তারা আঁধারের দরুন ন্যান্‌সি ও নোয়াকে তেমন ঠাহর করতে পারলো না।

নদীর ওপরে কুয়াশার ঢল নেমেছে। দু'একখানা নৌকোর আলো কুয়াশা ভেদ ক'রে ফুটে উঠেছে আবছাভাবে।

মিনিট-দুয়েক পরে সেখানে এসে একটা ভাড়াটে-গাড়ি থামলো। সেই গাড়িটা থেকে এক বুড়ো ভদ্রলোক নামলেন একটা তরুণীকে নিয়ে। বুড়ো ভদ্রলোক হলেন মিঃ ব্রাউন্‌লো, আর তরুণী হচ্ছে রোজ্।

ন্যান্‌সি তাড়াতাড়ি তাঁদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো : "এখানে নয় —এখানে এই সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে ভয় করছে···চলুন ওই পোলের সিঁড়ির ওপর।"—এই ব'লে সে সিঁড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলো।

দূর থেকে ন্যান্‌সির আঙুল-দেখানো দেখে, নোয়া আগে থাকতেই পা টিপে-টিপে সিঁড়ির নীচে গিয়ে লুকিয়ে রইলো।

ন্যান্‌সির পেছন-পেছন মিঃ ব্রাউন্‌লো এবং রোজ্ সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চললেন। কিছুদূর যাবার পরে মিঃ ব্রাউন্‌লো ন্যান্‌সিকে বললেন : "আমি আর এগোতে দেবো না আমার সঙ্গিনীকে···অনেক দূর এগিয়েছি তোমাকে খুশী করার জন্যে।"

"আমাকে খুশী করার জন্যে!"—জোরালো গলায় বললো ন্যান্‌সি : "বলুন! বলুন! আমি তো আগেই বলেছি, আপনাদের সঙ্গে এখানে

দাঁড়িয়ে কথা বলতে আমার ভয় করছে। কি যে হয়েছে আমার আজ, জানি নে হয়তো বা মরণের ভয়! রক্তমাখা লাশের চেহারা যেন সারাদিন আমার চোখে ভাসছে! সন্ধ্যের পর একখানা বই পড়ছিলাম—মনে হলো, ছাপার অক্ষরগুলোও যেন রক্তমাখা রয়েছে?"

রোজ্ মিঃ ব্রাউন্‌লোকে ন্যান্‌সির সাথে সদয় ব্যবহার করার জন্যে অনুরোধ করলো।

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেনঃ "গত রবিবার তো তুমি আসোনি এখানে?"

ন্যান্‌সি বললোঃ "আমাকে ওরা জোর ক'রে আটকে রেখেছিলো।"

মিঃ ব্রাউন্‌লো জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আজ এখানে আসার জন্যে তোমায় কেউ সন্দেহ করবে না তো?"

ন্যান্‌সি জবাব দিলোঃ "না, তা করবে না কেউ।"

মিঃ ব্রাউন্‌লোর আরও প্রশ্নের জবাবে ন্যান্‌সি জানালো যে, সে ফ্যাগিন্‌কে ধরিয়ে দিতে রাজী নয়। সে যুক্তি দেখিয়ে বললোঃ "সত্যি বটে সে বদ্ লোক, কিন্তু আমিও তো ভালো মেয়ে নই! একসঙ্গে বাস করি আমরা—ইচ্ছে করলে আমারও ক্ষতি করতে পারতো সে, কিন্তু তা তো সে করেনি!"

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেনঃ "তাহলে মঙ্ক্‌স্‌কে তুলে দাও আমার হাতে। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না এবং তোমার মত না নিয়ে ফ্যাগিন্‌কে আদালতে হাজির করাবো না।"

ন্যান্‌সি রোজ্‌কে জিজ্ঞাসা করলোঃ "আপনিও কি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন?"

রোজ্ বললোঃ "হ্যাঁ, আমিও এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

তখন ন্যান্‌সি এত নীচু গলায় কথা বলতে লাগলো যে, নোয়া তার গোপন স্থান থেকে কিছু কিছু শুনতে পেলো। মঙ্ক্‌সের গতিবিধি সম্বন্ধে ন্যান্‌সি যা জানতো, তা সে রোজ্ এবং মিঃ ব্রাউন্‌লোকে জানিয়ে বললোঃ "মঙ্ক্‌স্ দেখতে লম্বা···দুলে-দুলে চলে···চলার সময় মাঝে-মাঝে বাঁদিকে ঘাড় ফিরিয়ে সাথে-সাথে ডানদিকে ঘাড় ফেরায়···মুখখানা তামাটে রঙের ···আর সব সময় একটা লম্বা কোট প'রে তার কলারটা উঁচু ক'রে দিয়ে, গলা ঢেকে রাখে। তার গলায়—"

"একটা লাল দাগ আছে।"—বললেন মিঃ ব্রাউন্‌লো।

—"সে কি! আপনি চেনেন কি তাকে?"

—"বোধহয় চিনি। যাক্, তুমি বড় উপকার করলে আমাদের। এখন বলো, আমরা কি করতে পারি তোমার জন্যে।"

ন্যান্‌সি বললো: "কিছু না—কিছু না!"

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন: "তুমি একজন মহীয়সী রমণী। একটা অসহায় অনাথ ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছো। তোমাকে পুরোনো সাথীদের কাছে ফিরে যেতে দিতে চাই নে আমি। তুমি যদি চাও তো কাল ভোরের আগেই এদেশ থেকে বহুদূরে বিদেশের কোনো ভালো জায়গায় তোমাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি। সেখানে তুমি পাবে ভালো পরিবেশ, নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়। তাছাড়া অর্থের ভাবনা তোমার থাকবে না। তুমি শুধু রাজী হও—তারপর যা করার আমি করবো।"

ন্যান্‌সি বললো: "না-না, আমি আমার পুরোনো জীবন থেকে দূরে সরে যেতে পারি নে—এখন অনেকদূর এগিয়ে গেছি—অ।: সেখান থেকে ফিরে যেতে পারি নে।"

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন: "তাহ'লে আর কি করা যাবে! যাক্, চলি আমরা—তোমাকে বোধহয় কিছু বেশী সময় আট্‌কে রেখেছি।"

ন্যান্‌সি নীচু গলায় বললো: "হ্যাঁ।"

রোজ্ ও মিঃ ব্রাউন্‌লো চলে গেলেন। ন্যান্‌সি সিঁড়ির ওপর প্রায় উপুড় হয়ে প'ড়ে কেঁদে-কেঁদে তার মনের ব্যথা দূর করলো কিছুক্ষণ ধ'রে। তারপর দুর্বল শরীরে কাঁপতে-কাঁপতে চলে গেল সেখান থেকে।

নোয়া যখন উঁকি মেরে দেখে বুঝলো যে, সবাই চলে গেছে, তখন সে তার লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি ফ্যাগিনের আড্ডার দিকে এগিয়ে চললো।

* * *

ভোর হ'তে তখনো ঘণ্টা-দুয়েক বাকি। শরৎকালে এ-সময়টা মাঝরাত বলেই মনে করা হয়। চারদিক চুপচাপ—কোনো সাড়াশব্দ নেই কোথাও! ফ্যাগিন্ তার আস্তানায় ব'সে আছে—তার মুখ ফ্যাকাশে, চোখ দুটো লাল। মেঝের ওপর একখানা জাজিমে গভীর ঘুমে এলিয়ে আছে নোয়া।

ন্যান্‌সির ওপর ঘেন্নায় ও রাগে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে ফ্যাগিনের মন। সে নোয়ার এ কথায় বিশ্বাস করে নি যে, ন্যান্‌সি তাকে ধরিয়ে দিতে রাজী হয় নি।

এমন সময়ে একটা বাণ্ডিল হাতে সাইক্‌স্ সেখানে হাজির হলো।

বাণ্ডিলটা ফ্যাগিন্‌কে দিয়ে সে বললো ঃ "তুলে রাখো এটা···ভারী কষ্ট হয়েছে এটা জোগাড় করতে···নইলে দু-ঘণ্টা আগেই এখানে এসে পৌঁছোতাম।"

বাণ্ডিলটা তুলে রেখে ফ্যাগিন্ একনজরে সাইক্‌সের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে প্রতিহিংসার ছায়া।

সাইক্‌স্ জিজ্ঞাসা করলো ঃ "কি ব্যাপার, ফ্যাগিন্? অমন হাঁ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন?"

ফ্যাগিন্ রাগে এমন তেতে গিয়েছিলো, যে, চেষ্টা করেও সে কথা বলতে পারলো না।

সাইক্‌স্ বিরক্ত হয়ে ব'লে উঠলো ঃ "কি হলো ফ্যাগিন্? ক্ষেপে গেলে নাকি আমার ওপর? মারবে নাকি আমাকে?"

ফ্যাগিন্ কোনোমতে বললো ঃ "না, না, তোমার ওপর কোনো রাগ নেই আমার।"

সাইক্‌স্ এবার নিজের পকেটে লুকোনো পিস্তলটায় হাত রেখে মৃদু হেসে বললো ঃ "না থাকলেই ভালো, নইলে আমাদের মধ্যে খুনোখুনি হয়ে একজন হয়তো টেঁসে যেতো। কার কপালে মরণ ঘটতো, তা নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে আমাদের কাজ নেই।"

সাইক্‌সের কথায় কান না দিয়ে ফ্যাগিন্ বললো ঃ "তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা কথা আছে, বিল্।"

সাইক্‌স্ বললো ঃ "বলে ফ্যালো তাড়াতাড়ি, নইলে আর দেরী করলে ন্যান্‌সি হয়তো ভাববে যে, আমি মারা গেছি।"

—"তা, সে তোমাকে মেরে ফেলার পথ তৈরী করেই এসেছে! আচ্ছা, মনে করো, ওই যে ছেলেটা ওখানে প'ড়ে ঘুমোচ্ছে" বলেই ঘুমন্ত নোয়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতে লাগলো ফ্যাগিন্ ঃ "ও যদি আমাদের দুশমনদের কাছে গিয়ে আমাদের গোপন কথা ফাঁস ক'রে দেয়—যদি আমাদের আস্তানার খোঁজ আর আমাদের কারুর কারুর চেহারার বিবরণ দিয়ে আসে, তাহ'লে—তাহ'লে তুমি ওকে কি করবে?"

—"তাহ'লে আমি জুতোর তলার কাঁটা দিয়ে মাড়িয়ে ওর মাথাটা ঝাঁঝরা ক'রে দেবো।"

—"ঠিক তো?"

—"এখনই পরখ ক'রে দেখতে পারো আমাকে।"

—"যদি চার্লি বা ধুরন্ধর এমন জঘন্য কাজ করে? কিংবা—"

—"যে-কেউই হোক্ না কেন, বাছবিচার করবো না আমি···তাকে ওরকম সাজা দেবোই।"

সাইক্‌সের এ-কথা শুনে নোয়াকে ডেকে তুলে ফ্যাগিন্ তাকে ন্যান্‌সির গত রাতের গোপন অভিযানের কথা বলতে বললো।

নোয়া তখন খোলাখুলি বলে যেতে লাগলো, কিভাবে সে ন্যান্‌সির পিছু পিছু ধাওয়া ক'রে লণ্ডন ব্রিজ পর্যন্ত গিয়েছিলো, আর কিভাবে ন্যান্‌সি সেই বুড়ো ভদ্রলোক এবং তরুণীর সঙ্গে দেখা ক'রে মঙ্ক্‌সের কথা তাদের বলে দিয়েছিলো।

—"শয়তানী! শয়তানী!" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে সাইক্‌স্ লাফ দিয়ে দরজার দিকে মাতালের মতো ভীষণ হুঙ্কার ছড়িয়ে ছুটে গেলো। ব্যাপারটার সাংঘাতিক পরিণতি হবে বুঝতে পেরে ফ্যাগিন্ দৌড়ে পেছন থেকে সাইক্‌সের হাত পাকড়ে ধরলো, কিন্তু ফ্যাগিনের হাত ছাড়িয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো সাইক্‌স্।

ফ্যাগিন্ সাইক্‌সের পেছন পেছন দৌড়োতে দৌড়োতে তাকে অনুরোধ জানালোঃ "ন্যান্‌সির ওপর খুব বেশী অত্যাচার ক'রো না, বিল্! তাহলে আমাদের দলের সকলেরই বিপদ ঘটবে।"

কোনো জবাব না দিয়ে সাইক্‌স ছুটতে লাগলো। তারপর কোথাও না থেমে এবং কোনোদিকে না চেয়ে সোজা এসে সে হাজির হলো নিজের আস্তানায়। তারপর চুপচাপ ঘরে ঢুকেই দরজায় চাবি দিয়ে ন্যান্‌সিকে ঘুম থেকে জাগালো সে।

ন্যান্‌সি চম্‌কে জেগে উঠেই ব'লে উঠলোঃ "বিল্, তুমি!"

ঘরে একটা মোমবাতি জ্বলছিলো। সাইক্‌স্ বাতি নিবিয়ে দিয়ে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো ঘরের কানাচে।

ভোরের আলো ফুটে উঠেছে দেখে ন্যান্‌সি বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার পরদা সরিয়ে দিতে গেলো।

সাইক্‌স্ বাধা দিয়ে বললোঃ "পরদা যেমন আছে তেমনি থাক্, আমার কাজের জন্যে দরকারী আলো ঘরে আছে।"

ন্যান্‌সি সভয়ে বললোঃ "বিল্, তুমি অমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন?"

হিংস্র আক্রোশে সাইক্‌স্ দু-এক মুহূর্ত ন্যান্‌সির দিকে তাকিয়ে থেকে তার টুঁটি টিপে তাকে ঘরের এককোণে টেনে আনলো এবং হাত দিয়ে সজোরে তার মুখ চেপে ধরলো।

ন্যান্‌সি নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললো : "বিল্‌, বিল্‌, চেঁচাবো না আমি একটুও…কাঁদবো না এক ফোঁটা …শুধু আমাকে খুন করার আগে বলো, আমি তোমার কি করেছি!"

সাইক্‌স্ দাঁতে দাঁত চেপে বললো : "শয়তানী, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস্? জানিস্, কাল রাতে তোর পেছনে চর লেগেছিলো! তুই লুকিয়ে যেখানে গিয়েছিলি আমাদের সর্বনাশ করার জন্যে, তাদের যা বলে এসেছিস্ সেখানে, তা সবই জানি! বেইমান কোথাকার!"

ন্যান্‌সি আর্তনাদ ক'রে বলে উঠলো : "বিশ্বাস করো বিল্‌, আমি তোমাকে বাঁচাবারই চেষ্টা করেছি…তোমার সঙ্গে কোনো বেইমানি আমি করি নি! আমাকে খুন করার আগে আমার কথা শোনো…শুধু আমার জন্যে নয়, তোমার ভালোর জন্যেও বলছি, বিল্‌, আমায় খুন করার আগে আমাকে বলতে দাও সব কথা। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো, বেইমানি আমি করি নি।"

ন্যান্‌সির চুলের মুঠি ধরে তাকে মাটিতে ফেলে হিড়হিড় করে টান্‌তে টান্‌তে সাইক্‌স্ বললো : "মিছে কথা বলিস্ নে শয়তানী! কাল রাতে ওদের চর তোকে নজর করেছে, আর কি কি কথা বলেছিস্ তাও সে শুনেছে। এর পরেও কি তুই বলবি, বেইমানি করিস্ নি। বল্ হারামজাদি, আর কি বল্‌বি তাই বল্।"

সাইক্‌সের পা দুটো জড়িয়ে ধরে ন্যান্‌সি বলে ওঠে : "তোমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে চেষ্টা করেছি আমি, তার বদলে তোমার কাছে আমার প্রাণ ভিক্ষে চাইছি। ছেড়ে দাও আমাকে বিল্‌। ওরা আমাকে বিদেশে নিরাপদ আশ্রয় দিতে চেয়েছিলো। আমি…আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে তা নেই নি। তুমি চাও তো আমাদের দু'জনের জন্যেই বহু দূরে বিদেশে নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের জন্যে বলবো ওদের—ওরা তা নিশ্চয়ই দেবে আমাদের। আমাকে ছাড়ো—আমার গলা ছাড়ো! উঃ, বড্ডো লাগছে—মরে গেলুম বিল্‌…বিল্‌…"

এতক্ষণে সাইক্‌স্ ন্যান্‌সির গলা টিপে ধরেছে এক হাতে, আর অন্য হাতে নিজের পিস্তলটা বাগিয়ে ধরেছে। কিন্তু প্রচণ্ড রাগের মাথায়ও তার খেয়াল হলো যে, পিস্তল ছুঁড়লে লোক জানাজানি হয়ে যাবে, আর তাতে হয়তো তাকে খুনের দায়ে হাতেনাতে ধরা পড়তে হবে। তাই সে পিস্তলের উল্‌টো দিকটা দিয়ে ন্যান্‌সির কপালে ও মুখে বারবার সজোরে ঘা মারতে লাগলো।

ন্যান্‌সি মেঝের ওপর প'ড়ে গেলো···তার কপালের ও মুখের ক্ষত থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলো। সাইক্‌স্ তবুও থামলো না··· ন্যান্‌সির রক্তমাখা মুখের ওপর একনাগাড়ে প্রচণ্ড আঘাত হানতে লাগলো সে। ন্যান্‌সি আর সইতে পারলো না। তবুও বহু কষ্টে সে শেষবারের মতো হাঁটু গেড়ে উঠে একবার বসলো, তারপর বুকের ভেতর থেকে রোজের দেওয়া রুমালখানা বের ক'রে আকাশের দিকে মুখ তুলে হাত জোড় করে প্রার্থনা জানালো ভগবানের কাছে। মুখের ভাষা তার বেরুলো না··· বিড়বিড় করে কি যেন বলতে গিয়ে তার ঠোঁট দুটো কেবল সামান্য নড়ে উঠলো, তারপর ধীরে ধীরে স্থির হয়ে গেলো···সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ দুটো গেল বুঁজে চিরদিনের মতো।

সাইক্‌স্ তাতেও খুশী হলো না। ন্যান্‌সির দেহে প্রাণের বিন্দুমাত্র স্পন্দন থাকতে সে তাকে ছাড়বে না। তাই একগাছা ভারী লাঠি দিয়ে বারবার আঘাত করতে লাগলো মৃত ন্যান্‌সিকে। তারপর সে একখানা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলো ন্যান্‌সির দেহটাকে। প'ড়ে রইলো শুধু রক্ত আর মাংস···নরম তুলতুলে মাংস আর গাঢ় অঢেল রক্ত।

সাইক্‌স্ তখন আগুন জ্বেলে লাঠিগাছা পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেললো, হাতমুখ ধুয়ে পোশাক ঘষে' ঘষে' তুলে ফেলতে লাগলো রক্তের দাগ। পোশাকের কোনো কোনো জায়গা থেকে জলে ধুয়েও রক্তের দাগ উঠছে না দেখে, সাইক্‌স্ সে-সব জায়গা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেললো। তারপর কুকুরটাকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো সে। পথ দিয়ে যেতে যেতে একবার সে তার ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলো,—পরদাটা ঠিক তেমনি করে ঝুলছে। ন্যান্‌সি যে-আলোর জন্যে পরদাটা সরাতে গিয়ে-ছিলো, সে-আলো আর সে দেখবে না কোনো দিন।

সূর্য তখনও ওই জানলার ধারে-কাছে সকালের সোনালী কিরণ ছড়াচ্ছে।

শিস্ দিয়ে কুকুরটাকে ডেকে খুব জোরে পা চালিয়ে দিলো সাইক্‌স্ নতুন আস্তানার খোঁজে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার মুখে একখানা গাড়ি ক'রে নিজের বাড়ির দরজায় এসে নামলেন মিঃ ব্রাউন্‌লো সঙ্গে দুজন লোক নিয়ে। মিঃ ব্রাউন্‌লোর হুকুমে লোক দুজন গাড়ির ভেতর থেকে নামিয়ে আনলো মঙ্ক্‌স্‌কে।

তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠে, বাড়ির পেছনের দিকে একখানা ঘরের সামনে তারা মঙ্ক্‌স্‌কে নিয়ে হাজির হলো। তাদের পেছন পেছন এলেন মিঃ ব্রাউন্‌লো।

মঙ্ক্‌স্‌কে ঘরে ঢুকতে নারাজ দেখে মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন : "ঘরে না গেলে তোমাকে পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেবো।" সে-কথা শুনে ভয় পেয়ে মঙ্ক্‌স্ ঘরে ঢুকলো। মিঃ ব্রাউন্‌লো তাঁর সঙ্গীদের বললেন : "তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বাইরে যাও—আমি ডাকলে তবে এসো।"

লোক দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর মঙ্ক্‌স্ মিঃ ব্রাউন্‌লোকে বললো : "বাবার বন্ধু হয়ে চমৎকার ব্যবহার করছেন আমার সঙ্গে!"

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন : "তোমার বাবার বন্ধু বলেই তো এরকম ব্যবহার করতে হচ্ছে আমাকে, নইলে এতক্ষণ জেলে পচে মরতে। তোমার বাবার সঙ্গেই শুধু আমার গভীর বন্ধুত্ব ছিলো না, তোমাদের পরিবারের আরও একজনের সঙ্গে আমার ভালোবাসা ছিলো। বহুকাল আগে তোমার পিসীমার সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক হয়েছিলো, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছে ছিলো অন্যরকম, তাই বিয়ের আগেই তোমার পিসীমা মারা যান। তাঁরই স্মৃতি আজও বয়ে বেড়াচ্ছি আমি, তাই তোমার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করছি, এডওয়ার্ড্ ল্যাীফোর্ড।"

মঙ্ক্‌স্ বললো : "ও-নামের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?"

—"কিছু না! আমি খুব খুশী যে, তুমি ও-পদবী পাল্‌টে ফেলেছো।"

মঙ্ক্‌স্ বললো : "আমাকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছেন কেন, তা কি জানতে পারি?"

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন : "তোমার ভাইয়ের জন্যেই তোমাকে এখানে ধরে এনেছি তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে!"

—"আমার কোনো ভাই নেই!"

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন : "ধাপ্পা দিও না আমাকে। আমি তোমাদের পরিবারের সব খবর রাখি। তোমার বাবা বিয়ে করার কিছুকাল পরেই তোমার জন্ম হয়। তোমার বাবার পারিবারিক জীবন খুবই অশান্তিময়

ছিলো, বিশেষতঃ তোমার মা তোমার বাবার চেয়ে দশ বছরের বড়ো হওয়ার জন্যে। তারপর তোমার মায়ের চাল-চলনের ফলে তোমার বাবার জীবন নষ্ট হয়ে যেতে বসে। সে সময় তোমার মা তোমাকে নিয়ে বিদেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ান, আর তোমার বাবা নিজের দেশেই প'ড়ে থাকেন একলা দীর্ঘদিন ধরে।"

মঙ্ক্‌স্ বললো ঃ "আমি এসব কিছুই জানি নে।"

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন ঃ "মিথ্যে কথা, তুমি সবই জানো। এসময় তোমার বাবার সঙ্গে নৌবাহিনীর এক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং তাঁর স্ত্রী ও দুই মেয়ের আলাপ হয়। তখন বড় মেয়েটার বয়স উনিশ, ছোটোটা বছর-ছয়েকের। সেই বড় মেয়েটাকে তোমার বাবা বিয়ে করবেন বলে পাকা কথা দেন। এমন সময়ে এক মুমূর্ষু ধনী আত্মীয়কে দেখতে তোমার বাবা রোমে চলে যান, কেননা তিনি ওই আত্মীয়ের উত্তরাধিকারী ছিলেন। রোমে গিয়েই তোমার বাবা কঠিন রোগে পড়ে কয়েকদিনের মধ্যেই মারা যান। তিনি কোনো উইল ক'রে যেতে পারেন নি, তাই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হ'লে তুমি আর তোমার মা।"

বাবা কোনো উইল করে যান নি, এ কথা মিঃ ব্রাউন্‌লোর মুখ থেকে শুনে মঙ্ক্‌স্ এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

মিঃ ব্রাউন্‌লো আবার বলতে লাগলেন ঃ "রোমে যাবার আগে তোমার বাবা আমার কাছে কয়েকটা জিনিস রেখে যান। তার মধ্যে তাঁর নিজের হাতে-আঁকা একখানা ছবি ছিলো—সেখানা তাঁর বাগ্‌দত্তা বউয়ের। সেই আমাদের দুজনের শেষ দেখা। তাঁর মৃত্যুর পরে বাগ্‌দত্তা বউটার খোঁজ নিতে গিয়ে জানলুম যে, তাদের পরিবার পুরোনো বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছে কেউ তা জানে না।"

মিঃ ব্রাউন্‌লো আরও বললেন ঃ "কিছুদিন আগে তোমার ভাইকে আমি বদমাইস্‌দের দল থেকে উদ্ধার করি। তখন তাকে আমি তোমার ভাই বলে চিনতাম না। সে যখন অসুস্থ হয়ে আমার বাড়িতে ছিলো, তখন তার চেহারার সঙ্গে তোমার বাবার হাতে-আঁকা বাগ্‌দত্তা বউটার ছবিখানার মিল দেখে অবাক হয়ে যাই। তাছাড়া, তোমার ভাইয়ের চোখে-মুখে তোমার বাবার আদলও দেখতে পেয়ে আমার সন্দেহ বেড়ে যায়। কিন্তু তোমার ভাইয়ের ইতিহাস জানার আগেই তাকে রাস্তা থেকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলো ওরা। তারপর অনেক খোঁজ ক'রেও তার আর খবর পাই না। এদিকে তোমার মাও মারা গেছেন, আর তুমিও

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আছো বলে আমার তখন জানা ছিলো। তাই মনে হলো, তোমার ভাইয়ের ইতিহাস হয়তো তুমিই একমাত্র জানতে পারো। তাই তোমার খোঁজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে যাই। তারপর কতদিন কত জায়গায় খুঁজেছি তোমাকে, কিন্তু তোমার দেখা পেলাম আজ মাত্র দুঘণ্টা আগে।”

সদর্পে দাঁড়িয়ে মঙ্ক্‌স্‌ বললোঃ “এতেই আমাকে চোর আর জালিয়াৎ বলে ঠাওরালেন? আপনি এও নিশ্চিত জানেন না যে, আমার বাবার দ্বিতীয় পক্ষের কোনো ছেলে ছিলো কি না!”

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেনঃ “আগে তা জানতুম না বটে, কিন্তু গত পনেরো দিনের মধ্যে সব-কিছুই জেনে ফেলেছি। জেনেছি যে, ভাই তোমার হয়েছিলো, আর তুমিও তাকে ভালো করেই চেনো। উইলও ছিলো তোমার বাবার, কিন্তু তোমার মা নষ্ট ক'রে ফেলেছেন সেখানা। সেই উইলে তোমার ভাইয়ের সম্বন্ধে কিছু বলা ছিলো, আর তোমার মার কাছ থেকে সে খবরটাও তুমি পেয়েছো। তারপর রাস্তায় নিজের ভাইকে চুরির দায়ে পুলিশ ধরেছে দেখে খুশীতে তুমি ডগমগ হয়ে উঠলে, আর তার বাবার পরিচয়ের প্রমাণ সম্বন্ধে তো তুমি নিজেই বলেছো, ‘ছোঁড়াটার পরিচয়ের একমাত্র চিহ্ন এখন নদীর তলায়। আর যে-বুড়ী ওর মায়ের কাছ থেকে সেটা নিয়েছিলো, সেও আজ কবরে শুয়ে।’ এখনো কি তুমি আমার এসব কথার প্রতিবাদ করতে সাহস পাও, এডওয়ার্ড ল্যীফোর্ড?”

এ কথার প্রতিবাদ করার মতো কোনো উচিত জবাব সহসা খুঁজে না পেয়ে মঙ্ক্‌স্‌ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো।

দারুণ ক্রোধে মিঃ ব্রাউন্‌লো বলে চললেনঃ “ওই ঘৃণ্য শয়তান ফ্যাগিনের কাছে তুমি যা বলেছো, তার প্রতিটি কথাই আমি জানি। নির্যাতিত অলিভারের দুঃখে ন্যান্‌সির মতো মেয়েরও প্রাণ কেঁদে ওঠে··· অলিভারকে বাঁচাতে গিয়ে ন্যান্‌সি নিজের প্রাণ খোয়াতে বাধ্য হয়েছে··· তাকে যারা খুন করেছে তার মধ্যে তুমিও আছো।”

—“না-না, ন্যান্‌সির খুনের সাথে আমি জড়িয়ে নেই···তাকে খুন করার কারণও আমি কিছুই জানিনে।” ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে মঙ্ক্‌স্‌।

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেনঃ “তোমার গোপন কথা ন্যান্‌সি ফাঁস করে দিয়েছে বলেই তাকে খুন করা হয়েছে।”

একথা শুনে মঙ্ক্‌স্‌ খুব ভয় পেলো। সে মিস্টার ব্রাউন্‌লোর দাবী মেনে নিয়ে তাঁর কথামতো সাক্ষীর সামনে সব কথা খুলে ব'লে অলিভারকে

নিজের ভাই বলে স্বীকৃতি-পত্র লিখে দিতে এবং বাবার উইলমতো অলিভারকে তার পাওনা বুঝিয়ে দিতে আপত্তি করলো না।

মিঃ ব্রাউন্‌লো যখন মঙ্ক্‌স্‌কে নিজের কবজায় নিয়ে এসে তার সাথে একটা বোঝাপড়া করে ফেললেন অলিভারের বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে, সেই সময় ডাক্তার লস্‌বার্ন সে-ঘরে ঢুকে জানালেন যে, সাইক্‌স্‌কে গ্রেপ্তার করার জন্যে চারদিকে লোক পাঠানো হয়েছে, আর তার গ্রেপ্তারের জন্যে সরকার একশো পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এ-কথা শুনে মিঃ ব্রাউন্‌লো নিজে আরও পঞ্চাশ পাউণ্ড পুরস্কার দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন !

—"বেচারা মেয়েটার খুনের প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমার রক্ত টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটছে।" একথা ব'লে ডাক্তার লস্‌বার্ন চলে গেলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

টেম্‌স্‌ নদীর তীরে একটা মস্ত বড়ো বস্তি। লণ্ডনের বেশীর ভাগ বদমাইশদের আড্ডা সেখানে। কতকগুলো নোংরা সরু গলির গোলক-ধাঁধা পেরিয়ে সেখানে পৌঁছোতে হয়। গলিগুলোতে গরীবেরাই বাস করে থাকে পরিবার নিয়ে। গলিতে অনেকগুলো সস্তা মালপত্তরের দোকান। পথে বেকার শ্রমিকদের ভিড়। টেম্‌স্‌-নদীর একটা খাল আছে সেখানে। জোয়ারের সময় সেই খালটা জলে ভরে যায়। এ-অঞ্চলের বাড়িগুলো সবই জিরজিরে আর পোড়ো। যাদের পুলিসের নজর এড়িয়ে লুকিয়ে থাকতে হয়, বা অভাবের জন্যে যারা অন্য জায়গায় যেতে পারে না, তারাই এরকম বাড়িগুলোতে বাস করছে।

এই অঞ্চলেই বেশ একটা বড়ো বাড়ির দোতলায় একখানা ঘরে বিকেল-বেলা বসে ছিলো—টোবি ক্র্যাকিট, টম্‌ চিটলিং, আর একটা পুরোনো ডাকাত—তার নাম ক্যাগ্‌স্‌।

চিটলিং জানালো যে, বেলা দুটোর সময় ফ্যাগিন্‌ ধরা পড়েছে পুলিসের হাতে, আর কোনোমতে ঘরের চিমনি বেয়ে সে আর চার্লি পালিয়ে এসেছে। বোল্টার একটা খালি চৌবাচ্চার ভেতরে লুকিয়েছিলো, কিন্তু শেষে সে-ও ধরা প'ড়েছে। 'ত্রিভঙ্গ' সরাইখানার সকলকেই কয়েদ করা হয়েছে।

ক্যাগ্‌স্ বললো যে, বোল্টার নিশ্চয়ই রাজসাক্ষী হবে।

এমন সময়ে সাইক্‌সের কুকুরটা হাঁপাতে-হাঁপাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে নেতিয়ে পড়লো। ওরা তাকে জল খেতে দিলো।

সন্ধ্যা উতরে যেতেই একটা মোমবাতি জ্বেলে ওরা চুপ ক'রে বসে আছে, এমন সময় সদর দরজায় ঘন-ঘন ধাক্কার শব্দ শোনা গেল।

সেই শব্দে কুকুরটা কান খাড়া করে উঠলো। ক্র্যাকিট দরজা খুলে দিতেই যে-লোকটা ঘরে ঢুকলো, তার মুখ চোখ ব'সে গেছে···দাড়ি কামানো হয়নি বোধহয় তিন দিন···যেন সাইক্‌সের প্রেত সে !

ছু-একটা কথার পর সাইক্‌স্ ক্র্যাকিটকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ "তুমিই তো এ-বাড়ির কর্তা···তুমি কি আমাকে এখানে থাকতে দেবে ?"

ক্র্যাকিট্ একটু ইতস্ততঃ ক'রে উত্তর দিলো ঃ "তুমি নিরাপদ বোধ করলে এখানে থাকতে পারো।"

আবার সদর দরজায় কড়া ন'ড়ে উঠলো। এবার এলো চার্লি বেট্‌স্। ঘরে ঢুকে সাইক্‌স্‌কে দেখেই দুপা পিছিয়ে গিয়ে সে ব'লে উঠলো ঃ "আগে থেকে আমাকে এ কথা কেন বলোনি, টোবি ? আমাকে অন্য কোনো ঘরে বসতে দাও !"

সাইক্‌স্ তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো ঃ "চার্লি ! চার্লি ! তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো না ?"

চার্লি আরও পিছিয়ে গিয়ে বললো ঃ "আমার কাছে এসো না তুমি··· দানো কোথাকার !"

শুনেই মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে পড়লো সাইক্‌স্।

চার্লি ডান হাত মুঠো ক'রে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো ঃ "তোমরা সবাই জেনে রেখো···আমি ভয় করি নে ওকে···ওরা ধরতে এলে আমি ওকে ধরিয়ে দেবো। ওর সাহস থাকে তো আমাকে খুন করুক···আমি নিশ্চয়ই ওকে ধরিয়ে দেবো !"

সাইক্‌স্ আর সইতে পারে না চার্লির মতো একটা ছোকরার বেপরোয়া বেইমানি। সে চার্লির দিকে হিংস্র আক্রোশে তাকাতেই চার্লি চেঁচাতে লাগলো ঃ "আমাকে খুন করলে ! কে আছো, বাঁচাও !" এই ব'লে সে হঠাৎ সাইক্‌সের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ঘুষি ও লাথি মেরে মাটিতে ফেলে দিলো।

হঠাৎ চার্লির এই কাণ্ড দেখে ঘরের অন্য তিনজন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, আর ওরা দুজনে মাটির ওপর প'ড়ে ধস্তাধস্তি করতে লাগলো।

সাইক্‌সের কিল-চড় উপেক্ষা ক'রে চার্লি সাহায্যের জন্যে চেঁচাতে শুরু করলো, কিন্তু সাইক্‌স্ তাকে হাঁটুর নীচে ফেলে তার গলা চেপে ধরলো। এই সময় ক্র্যাকিট্ সভয়ে জানালার দিকে আঙুল বাড়াতেই সকলে দেখলো, বাইরের গলিতে মশালের আলো দেখা যাচ্ছে—শোনা যাচ্ছে অনেক লোকের চেঁচামেচি আর পায়ের শব্দ। তাদের মধ্যে একজনকে দেখা গেল ঘোড়ার পিঠে। তিনি হচ্ছেন ডাক্তার লস্‌বার্ন। কিছুক্ষণ বাদে বাড়ির সদর দরজায় জোর জোর ঘা পড়তে লাগলো, আর জনতার ভীষণ চেঁচামেচি শোনা গেলো।

গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো চার্লি : "হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানেই আছে সেই খুনে লোকটা! দরজা ভেঙে ফ্যালো তোমরা!"

সঙ্গে সঙ্গে নীচের দরজা-জানলায় আবার জোর ধাক্কা পড়তে লাগলো।

দাঁত খিঁচিয়ে সাইক্‌স্ ব'লে উঠলো : "এমন একটা ঘর খুলে দাও, যেখানে এই শয়তানের বাচ্চাটাকে আট্‌কে রাখতে পারি!"

চার্লিকে টেনে হিঁচড়ে একটা ঘরে আট্‌কে রেখে, সাইক্‌স্ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জনতার উদ্দেশে বললো : "তোমাদের যা ক্ষমতা আছে করো—আমি ঠিক তোমাদের কলা দেখাবো।"

একথা শুনে জনতা হৈ-হৈ ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো।

ঘোড়-সওয়ার ডাক্তার লস্‌বার্ন চেঁচিয়ে ঘোষণা করলেন : "যে একখানা মই এনে দিতে পারবে, তাকে বিশ গিনি পুরস্কার দেবো।"

ঘোড়-সওয়ারের কাছাকাছি লোকগুলো সেই ঘোষণা আওড়াতে লাগলো। কেউ কেউ মই নিয়ে আসার জন্যে চেঁচাতে লাগলো ; কেউ কেউ মশাল-হাতে ছুটোছুটি শুরু করলো ; আবার কেউ-বা পাগলের মতো বাড়ির দেওয়াল বেয়ে দোতলায় ওঠার চেষ্টা করতে লাগলো।

সাইক্‌স্ একগোছা লম্বা দড়ি যোগাড় ক'রে বাড়ির ছাদে গিয়ে উঠলো। আশে-পাশের বাড়ির ছাদে ও বারান্দায় যে-সব উৎসুক নরনারী দাঁড়িয়ে ছিলো, তারা চেঁচিয়ে নীচের জনতাকে জানিয়ে দিলো যে, খুনে লোকটা ছাদে উঠেছে। এদিকে কার্নিসের ওপরে দাঁড়িয়ে সাইক্‌স্ নীচে তাকিয়ে দেখলো, খালে জল নেই, শুধু কাদা, আর কাদা, অনেকটা খাদের মতো।

অতো উঁচু থেকে কিভাবে লাফিয়ে খালে পড়বে তা ভাবতেই গা শিউরে উঠলো সাইক্‌সের। তার চোখে-মুখে হতাশা দেখা গেলো।

জনতার মধ্যে ছিলেন মিঃ ব্রাউন্‌লো। তিনি এবার চেঁচিয়ে ব'লে

উঠলেন ঃ "যে ওই খুনেকে জ্যান্ত ধরতে পারবে, তাকে পঞ্চাশ পাউণ্ড পুরস্কার দেবো।"

জনতা গর্জে উঠে সাইক্‌স্‌কে ধরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো!

সাইক্‌স্‌ মরিয়া হয়ে ছাদের দরজা দিয়ে বাড়ির চিম্‌নির মাথায় উঠে দাঁড়ালো। হাতে তার একটা লম্বা শক্ত দড়ি। নীচে থেকে চিম্‌নির মাথায় সাইক্‌স্‌কে দেখে জনতা ভীষণ হৈ-হল্লা করতে লাগলো। সাইক্‌স্‌ ওদিকে নজর না দিয়ে দাঁত ও হাত দিয়ে অপূর্ব কৌশলে এক মুহূর্তের মধ্যে দড়ির একটা ফাঁস তৈরী করলো, আর সেই দড়ির একমাথা বাঁধলো চিমনির সঙ্গে। তার মতলব ছিলো, ফাঁসটার মধ্যে মাথা গলিয়ে সেটা ডান বগলের তলা দিয়ে নিজের শরীরটাকে ফাঁস দিয়ে ভালো করে বাঁধবে, যাতে চিমনির মাথা থেকে দড়ি ফেলে তা বেয়ে পেছনের খাদে নামার সময় কোনো অসুবিধা না হয়। খাদের মাটিতে পড়ার কিছু আগেই দড়িটাকে কেটে ফেলার জন্যে সে হাতে একটা ছুরি নিলো। ছুরিটা বাগিয়ে ধ'রে ফাঁসটার মধ্যে নিজের মাথা গলিয়ে দিতে যাবে, এমন সময় তাকে লক্ষ্য ক'রে জনতা ভীষণ গর্জে উঠলো।

খুব তাড়াতাড়ি সাইক্‌স্‌ ফাঁসের মধ্যে মাথা গলিয়ে দিলো, কিন্তু ফাঁসের দড়িটা ডান বগলের তলায় টেনে আনার আগেই হঠাৎ বিকারের ঘোরে সে চেঁচিয়ে উঠলো ঃ "আবার সেই চোখ!"

তারপরই কাঁপতে-কাঁপতে পড়ে গেল সে চিমনির মাথা থেকে, আর ফাঁসটা বগলের তলায় না আট্‌কে গলায় জড়িয়ে গেল। প্রায় পঁয়ত্রিশ ফুট নীচে ঝুলে পড়লো সাইক্‌স্‌ ফাঁসটা গলায় জড়িয়ে, আর তার প্রাণহীন দেহটা দড়িতে ঝুলতে লাগলো···ছুরি-ধরা হাতের মুঠোটা তখন শক্ত হয়ে গেছে!

এই সময়ে সাইক্‌সের কুকুরটা কোথা থেকে ছুটে এসে ঝুলন্ত দড়িটা তাক ক'রে একটা লাফ দিলো, কিন্তু দড়ির নাগাল না পেয়ে একেবারে খাদের মধ্যে গিয়ে পড়লো, আর একটা পাথরে তার মাথা ছেঁচে গিয়ে ঘিলু বেরিয়ে পড়লো!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মঙ্ক্‌সের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে যাবার দুদিন পরে অলিভার গাড়ি ক'রে যাচ্ছিলো সেই অনাথ-আশ্রমে যেখানে সে জন্মেছিলো। তার সঙ্গে ছিলেন মিসেস্ মেইলী, রোজ্ ও মিসেস্ বেড়ুইন্। মিস্টার ব্রাউন্‌লো অপর সঙ্গীদের নিয়ে আরেকখানা গাড়িতে আসছিলেন।

গাড়ি যতই অনাথ-আশ্রমের কাছাকাছি এগিয়ে এলো, ততই অলিভারের চোখের সামনে তার ছেলেবেলার ঘটনাগুলো ভেসে উঠতে লাগলো—সেই পথঘাট, সেই বাড়িঘর, এমন কি, অনাথশালার দরোয়ানটা পর্যন্ত ঠিক তেমনি আছে। এসব দেখে অলিভার কখনও হেসে উঠলো… কখনও বা কাঁদতে লাগলো।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো শহরের সেরা হোটেলের সামনে, যে-হোটেলের দিকে অলিভার তার ছেলেবেলায় তাকিয়ে থাকতো ভয়-মেশানো সম্ভ্রম নিয়ে। এই হোটেলেই দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মিসেস্ মেইলী, মিসেস্ বেডুইন ও রোজ্ অলিভারকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে চুপচাপ ব'সে কাটালেন বাকী দিনটা।

রাত ন'টায় মিস্টার গ্রীম্‌উইগ্ আর মিস্টার ব্রাউন্‌লো সেই ঘরে ঢুকলেন মঙ্ক্‌স্‌কে নিয়ে। মঙ্ক্‌স্‌কে দেখে অলিভার আঁতকে উঠলো। মঙ্ক্‌সের চোখে-মুখেও নিদারুণ ঘৃণার ছাপ ফুটে বেরুলো।

মিস্টার ব্রাউন্‌লোর হাতে একতাড়া কাগজ ছিলো। তিনি জানালেন যে, লণ্ডনের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সামনে মঙ্ক্‌সের কাছ থেকে এই স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে। তারপর তিনি অলিভারকে দেখিয়ে মঙ্ক্‌স্‌কে বললেনঃ "এডওয়ার্ড ল্যীফোর্ড, এই হলো তোমার বৈমাত্রেয় ভাই—তোমার বাপ এবং য়্যাগনেস্ ফ্লেমিংয়ের একমাত্র ছেলে।"

মিস্টার ব্রাউন্‌লোর হুকুমে মঙ্ক্‌স্ সকলের সামনে আসল কথাটা প্রকাশ করলো। সে জানালো যে, রোমে তার ও অলিভারের বাবা যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, মঙ্ক্‌সের মা তখন প্যারিসে ছিলেন। স্বামীর গুরুতর অসুখের খবরটা শুনেই তিনি সম্পত্তির লোভে ছুটে যান সেখানে। মঙ্ক্‌সের বাবার কাগজপত্তরের মধ্যে অলিভারের মায়ের কাছে লেখা একখানা চিঠি এবং তাঁর উইল ছিলো। সেই চিঠিতে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, য়্যাগনেস্ তাঁর বাগ্‌দত্তা বউ, আর সেই উইলে তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন যে,

মঙ্ক্‌স্ ও তার মা প্রত্যেকে বছরে আটশো পাউণ্ড ক'রে বৃত্তি পাবে এবং বাকি সম্পত্তি সমান দু ভাগে ভাগ হবে—এক ভাগ পাবে য়্যাগনেস্ এবং বাকিটা পাবে য়্যাগনেসের ছেলে। উইলে শর্ত ছিলো যে, য়্যাগনেসের ছেলে যদি নাবালক বয়সে বদ্-সঙ্গীদের সাথে মিশে উচ্ছন্নে না যায়, তবেই সে তার বাবার সম্পত্তি পাবে, নইলে তার পাওনা ভাগটা সবই পাবে মঙ্ক্‌স্।

মঙ্ক্‌স্ আরো জানালো যে বাবার এই চিঠি ও উইল তার মা নষ্ট ক'রে ফেলেন। তারপর তিনি য়্যাগনেসের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা ক'রে য়্যাগনেসের নামে নানারকম মিথ্যা অপবাদ দেন। ফলে, তার পরদিনই য়্যাগনেসের বাবা সে-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে, কাউকে ঠিকানা না জানিয়ে অন্য জায়গায় চ'লে যান। য়্যাগনেস্ এর আগেই বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। বাড়ি বদলানোর ক'দিন পরেই য়্যাগনেসের বাবা মনের দুঃখে হার্টফেল ক'রে মারা যান।

মঙ্ক্‌স্ এবার বললো যে, মারা যাবার কয়েকদিন আগে তার মা সেই উইল ও চিঠির বিষয়ে সমস্ত গোপন খবর তার কাছে ফাঁস ক'রে দেন। মঙ্ক্‌সের মা সে-সময় মঙ্ক্‌স্‌কে আরও বলে যান যে তাঁর ধারণা, য়্যাগনেসের একটা ছেলে হয়েছে এবং সেই ছেলের ব্যাপারে সে যেন সব-সময় সাবধানে থাকে। একথা শুনে মঙ্ক্‌স্ তার মায়ের কাছে শপথ করে যে, সে তার বৈমাত্রেয় ভাইকে বেকায়দায় ফেলে জেলে পাঠিয়ে ঘানি টানাবে, আর এভাবে বাপের উইলের শর্ত অনুসারে তার ভাইয়ের পাওনা ভাগটা সে নিজেই ভোগ করবে।

তারপর মঙ্ক্‌স্ বললো যে, তার মায়ের মৃত্যুর পরে সে অলিভারকে হঠাৎ রাস্তায় ফ্যাগিনের দলের লোকদের সাথে দেখতে পায়। তখন সে ফ্যাগিনের কাছে গিয়ে তাকে অনেক টাকার লোভ দেখালো, যাতে ফ্যাগিন্ অলিভারকে আটকে রেখে ধীরে ধীরে পাকা চোর বানিয়ে দেয়। মঙ্ক্‌স্ আরও বললো যে, মিসেস্ বাম্ব্‌লের কাছ থেকে সে কায়দা করে য়্যাগনেসের লকেট ও আংটি হাতিয়ে নিয়ে নষ্ট ক'রে ফেলেছে। শেষে মঙ্ক্‌স্ বললো যে, অলিভারের খোঁজ করার জন্যে সে ফ্যাগিন্‌কে নিয়ে মিসেস্ মেইলীর বাড়িতে গিয়েছিলো এবং জানালায় অলিভারকে বসে থাকতে দেখেছিলো।

মঙ্ক্‌স্ থামলে মিঃ ব্রাউন্‌লোর ইশারায় মিঃ গ্রীম্‌উইগ্ উঠে গিয়ে

বাম্ব্‌ল্‌-দম্পতিকে নিয়ে এলেন। ঘরে ঢুকেই আন্তরিকতার ভান করে ব'লে উঠলেন মিস্টার বাম্ব্‌ল্‌ঃ "আরে-আরে অলিভার যে! আঃ, অলিভার! তোমার জন্যে আমি এতোদিন কী দুঃখই-না পেয়েছি!"

মিসেস্‌ বাম্ব্‌ল্‌ ধমকে উঠলেন ঃ "চুপ্‌ করো, বোকচন্দর!"

মিস্টার বাম্ব্‌ল্‌ বললেন ঃ "আঃ, মিসেস্‌ বাম্ব্‌ল্‌! তুমি বুঝতে পারছো না—এই উচ্ছ্বাসটা যে স্বাভাবিক! কত যত্নে ওকে লালন-পালন করেছি আমি···ওর কথা কি আমি ভুলতে পারি? আমি চিরকাল ভালোবেসেছি ওকে ঠিক আমার বুড়ো ঠাকুরদাদার মতো।"

মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌ এবার রেগে ব'লে উঠলেন ঃ "আরে মশাই, আপনার উচ্ছ্বাসটা একটু থামান তো!"

মিস্টার বাম্ব্‌ল্‌ বললেন ঃ "ও, আচ্ছা, বেশ-বেশ! তা, আপনি কেমন আছেন স্যার?" প্রশ্নটা করলেন তিনি মিঃ ব্রাউন্‌লোকে।

মিঃ ব্রাউন্‌লো সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মিসেস্‌ বাম্ব্‌ল্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি মঙ্ক্‌স্‌কে চেনেন কিনা। মিসেস্‌ বাম্ব্‌ল্‌ সাফ জবাব দিলেন—না। সোনার লকেট ও আঙ্‌টির কথাও অস্বীকার করলেন তিনি। তখন মিঃ ব্রাউন্‌লোর ইশারায় মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌ আবার উঠে গিয়ে বাইরে থেকে দু'জন বুড়ীকে নিয়ে এলেন সেখানে।

বুড়ী দু'জন জানালো যে, স্যালী-বুড়ী মরবার সময়ে মিসেস্‌ বাম্ব্‌ল্‌কে যা বলেছিলো, তারা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে তা স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলো। তাছাড়া তারা মিসেস্‌ বাম্ব্‌ল্‌কে বন্ধকীর দোকান থেকে একটা লকেট ও সোনার আঙ্‌টি ছাড়িয়ে আনতে দেখেছে।

মিসেস্‌ বাম্ব্‌ল্‌ এবার সব কিছু স্বীকার করলেন।

মিস্টার বাম্ব্‌ল্‌ ভয় পেয়ে মিঃ ব্রাউন্‌লোকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই ঘটনার ফলে তাঁর অনাথ-আশ্রমের চাকরিটা যাবে কি না!

মিঃ ব্রাউন্‌লো জানালেন ঃ "নিশ্চয়ই যাবে।"

মিস্টার বাম্ব্‌ল্‌ বললেন যে, এ-ব্যাপারে তাঁর কোন দোষ নেই—সব দোষ তাঁর স্ত্রীর।

মিঃ ব্রাউন্‌লো বললেন ঃ "এ-কৈফিয়ত আইন মানবে না, কেননা সব জেনে শুনেও পরিচয় চিহ্নটা নষ্ট করা হয়েছে এবং আইন ধরে নেবে যে, তাঁরই কথামতো তাঁর স্ত্রী এই বেআইনী কাজ করেছেন।"

মিস্টার বাম্ব্‌ল্‌ বললেন ঃ "আইন যদি এ-কথা ধরে নেয় তো, আইন একটা নিরেট গাধা। আইন তাহ'লে কখনো বিয়ে করেনি!"

একথায় সকলে হো-হো করে গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলো।

বাম্ব্‌ল্‌-দম্পতি চলে গেলে মিঃ ব্রাউন্‌লোর প্রশ্নের জবাবে মঙ্ক্‌স্‌ জানালো, য়্যাগনেসের ছোটো বোন রোজ্‌কে সে এর আগে বহুবার দেখেছে! সে আরও জানালো যে, বাবাকে হারিয়ে রোজ্‌ একেবারে অনাথ হয়ে পড়ে। তখন এক গরীব ছা'পোষা লোক দয়াপরবশ হয়ে তাকে লালন-পালন করতে থাকে। আত্মীয়-স্বজনেরা রোজের খোঁজ না পেলেও, মঙ্ক্‌সের মা কিন্তু তাকে খুঁজে বের করেন এবং তার আশ্রয়দাতাকে কিছু টাকা দিয়ে য়্যাগনেস্‌ এবং রোজের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আসেন। রোজ্‌কে আশ্রয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়াই ছিলো তার মায়ের মতলব। এসময়ে একজন বিধবা-মহিলা রোজ্‌কে দেখে দয়াপরবশ হয়ে নিজের বাড়িতে এনে লালন-পালন করতে থাকেন।

মিঃ ব্রাউন্‌লো জিজ্ঞাসা করলেন: "রোজ্‌কে কি এখানে দেখতে পাচ্ছো?"

রোজের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মঙ্ক্‌স্‌ বললো: "হ্যাঁ, ওই যে হাতের ওপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রোজ্‌।"

অলিভার রোজ্‌কে জড়িয়ে ধ'রে বললো: "আমি কিন্তু তোমাকে মাসী ব'লে ডাকবো না—দিদি ব'লেই ডাকবো।"

কিছুক্ষণ পরে হ্যারী মেইলী এসে ঢুকলো সেই ঘরে। তখন রোজ্‌ আর হ্যারীকে সে-ঘরে রেখে বাকী সবাই বেরিয়ে গেল।

হ্যারী রোজ্‌কে জানালো যে, রোজের পুরোনো ইতিহাসের সব-কিছুই সে আগে থেকে জানে…এখন তো রোজের অপবাদ দূর হয়ে গেছে, তাই সে আবার এসেছে রোজের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে।

রোজ্‌ তবুও এ বিয়েতে রাজী হলো না। সে বললো যে, যদিও সে আজ অপবাদ থেকে রেহাই পেয়েছে, তাহলেও সে গরীব, আর হ্যারী শুধু বড়লোকই নয়—আইন-সভার সদস্যও বটে।

হ্যারী তখন জানালো যে, এ বাধাও আর নেই, কেননা রোজের সঙ্গে নিজের অবস্থার তফাতটা দূর করার জন্যে সে আইন-সভার সদস্যের পদে ইস্তফা দিয়ে গাঁয়ের গির্জায় পাদরীর চাকরি নিয়েছে। এবার থেকে তার জীবন হবে শান্ত…সহজ…সরল অনাড়ম্বর।

অগত্যা রোজ্‌ এ বিয়েতে রাজী হ'তে বাধ্য হলো।

* * *

আদালতের বিচারে ফ্যাগিনের প্রাণদণ্ড হলো। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অনেক। ছোটো ছোটো ছেলেদের দলে টেনে তাদের চোর ও পকেটমার বানিয়ে অর্থ যোগাড় করাই ছিলো তার প্রধান পেশা—তাছাড়া সিঁধেল চোর, ডাকাত প্রভৃতি নানা অসামাজিক লোকের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিলো ঘনিষ্ঠ···শেষে সাইক্‌স্‌কে তাতিয়ে ন্যান্‌সিকে খুন করার মূলে ছিলো সে।

আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো ফ্যাগিনের বিচারের সময়। দর্শকরা ফ্যাগিনের ওপর আক্রোশে ফেটে পড়লো। অনেক কষ্টে আদালতের কর্মচারীরা তাদের শান্ত করলো।

ফ্যাগিন্ বললো যে, অনাথ ছেলেদের দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে সে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করতো তাদের কাজকর্ম যোগাড় করে দিতে। তাই তারা তার কাছে আশ্রয় নিতো। সে স্বীকার করলো যে, নিদারুণ অভাবের জন্যে হয়তো বা তাদের কেউ কেউ পকেটমারের কাজ করতো, কিন্তু সেজন্যে সে মোটেই দায়ী নয়। তার উদ্দেশ্য ছিলো মহৎ—অনাথদের সেবা করা।

ন্যান্‌সিকে খুনের ব্যাপারে ফ্যাগিন্ স্বীকার করলো যে সে সাইক্‌স্‌কে সাধ্যমতো বুঝিয়েছিলো খুন না করতে, কিন্তু সাইক্‌স্ ছিলো জেদী ও গোঁয়ার। সে তার কোনো কথা না শুনেই খুন করে বসলো ন্যান্‌সিকে।

ফ্যাগিন্ নিজের সাফাই গাইলেও আদালত তাকে ক্ষমা করলো না। বিচারে তার ফাঁসীর সাজা হয়ে গেল।

ফাঁসীর দিন জেলখানায় লোক জমায়েত হলো দলে দলে। ন্যান্‌সির মতো সমাজের আঁস্তাকুড়ের অসহায় মেয়ে কিভাবে নিজের জীবন বলি দিয়ে একটা অনাথ ছেলেকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো সেকথা ছড়িয়ে পড়েছিলো লোকের মুখে মুখে। ন্যান্‌সি মহীয়সী হয়ে উঠেছে সকলের কাছে। তাই ন্যান্‌সিকে খুনের অপরাধে যাকে ফাঁসী দেওয়া হচ্ছে, সেই মহাপাপীকে দেখার ইচ্ছে হলো অনেকের, বিশেষ করে যারা এর আগে আদালতে ফ্যাগিন্‌কে দেখতে পায়নি তারা এসে ভিড় করলো জেলখানার দরজায়।

ফাঁসিকাঠে নিয়ে যাবার সময় ফ্যাগিন্‌কে একটা সরু গলিপথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। সেই গলিপথের চারদিকে জনতা দাঁড়িয়ে ফ্যাগিন্‌কে গালিগালাজ করতে লাগলো, তাদের মধ্যে কেউ বা থুথু দিলো তার গায়ে, কেউ বা ছেঁড়া জুতো ছুঁড়লো তার দিকে।

অসংখ্য লোকের গালিগালাজ শুনতে-শুনতে ফ্যাগিন্ গিয়ে ফাঁসিকাঠের সামনে হাজির হলো। প্রাণভয়ে তার পা থরথর করে কাঁপছে তখন। মনে পড়লো ন্যান্সিকে ও সাইক্‌স্‌কে। তাদের কথা মনে করতে করতে ফ্যাগিন্ ফাঁসিকাঠে ঝুলে পড়লো।

* * *

এর পরের কাহিনী খুবই ছোটো। তিন মাসের মধ্যেই হ্যারী আর রোজের বিয়ে হয়ে গেল। হ্যারী যে-গাঁয়ের গির্জায় পাদরীর পদ পেয়েছিলো, সেখানে সে রোজ্‌কে নিয়ে গিয়ে বাস করতে লাগলো। মিসেস্ মেইলীও তাদের সঙ্গে বাস করতে গেলেন।

বাবার উইল-মতো অলিভার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়েও, মিস্টার ব্রাউন্‌লোর উপদেশে মঙ্ক্‌স্‌কে একটা ভাগ ছেড়ে দিলো। মঙ্ক্‌স্ সে-টাকা নিয়ে সুদূর আমেরিকার এক শহরে চ'লে গেল। সেখানেও সে আবার খারাপ দলে মিশে কিছুদিনের মধ্যেই সব সম্পত্তি উড়িয়ে ফেললো। তারপর জালিয়াতির অপরাধে হলো তার সশ্রম কারাবাস আর জেলের মধ্যেই রোগে ভুগে সে একদিন মারা গেল।

মিঃ ব্রাউন্‌লো অলিভারকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ ক'রে, হ্যারী ও রোজের বাড়ির মাইলখানেক দূরে এসে বাসা বাঁধলেন। মিঃ গ্রীম্‌উইগ্‌ও তাঁর চিরসাথী হয়ে রইলেন সেখানে।

ডাক্তার লস্‌বার্নেরও আর তাঁর কাজের জায়গায় মন টিকলো না। তিনি তাঁর ডাক্তারখানা সহকারীকে দান ক'রে, হ্যারীদের গাঁয়ের ধারে একখানা কুটীর কিনে বাস করতে লাগলেন।

রাজসাক্ষী হয়ে শাস্তি থেকে রেহাই পেয়েছিলো নোয়া ক্লেপোল্। সে এখন শার্লটির সাথে বেসরকারী গোয়েন্দার কাজ করতে লাগলো।

বাম্ব্‌ল্‌-দম্পতি চাকরি খুইয়ে, অনাথ-আশ্রমেই আশ্রয় নিয়ে অতি দীনভাবে জীবন কাটাতে লাগলেন।

গাইল্‌স্ আর ব্রিট্‌ল্‌সের অবস্থা দেখে বোঝাই যেতো না, তারা আসল কাদের চাকর। কখনও মেইলী-পরিবার, কখনও বা মিঃ ব্রাউন্‌লো ও অলিভার, কখনও-বা ডাক্তার লস্‌বার্নের বাড়িতে তারা থাকতো।

চার্লস্ বেট্‌স্ এর পর থেকে ভালোভাবে জীবন কাটানোর কড়া সংকল্প নিয়ে নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো নর্দাম্পটন্‌শায়ারের সবচেয়ে সুখী রাখাল হিসেবে।

রোজের স্নেহে ও মিস্টার ব্রাউন্‌লোর যত্নে অলিভার দিন-দিন নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠতে লাগলো।

* * *

আজও পথিকেরা পথ চলার সময় একবার থম্‌কে থামে অলিভারের জন্মস্থানের পুরোনো গির্জার প্রাঙ্গণে—যেখানে একটা কবরের ওপরে একখানা স্মৃতিফলকে সোনার অক্ষরে একটা নাম লেখা আছে—'য়্যাগনেস্‌'!

সমাপ্ত